কেদার-বদরীর পথে ।

প্রাপ্তিস্থান।

২৩৩ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া।

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স,
৯০।২এ হ্যারিসান রোড, কলিকাতা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

হাওড়া।
১৭২নং গ্রুণ্ট রোড, হাওড়া কুষ্ঠ কুটীর;
দি, টিউটোরিয়াল প্রেস হইতে মুদ্রিত।

কেদার-বদরীর পথে।

শ্রীবীরেশচন্দ্র দাস, বি, এল,
প্রণীত।



এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স,
৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

১৩২৮।

মূল্য দেড় টাকা মাত্র



পিতৃদেব স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র দাস।

যাঁহার সেবায় সর্ব্ব-ধর্ম্ম
যাঁহার কৃপায় সাক্ষাৎ স্বর্গ
যাঁহার শ্রীচরণ সর্ব্ব-তীর্থ
সেই
স্বর্গীয় পিতৃ-দেবের
শ্রীপদে
অর্পিত হইল॥

মুখবন্ধ।



রেল কোম্পানির কৃপায় বাঙ্গালা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা গঙ্গা কাশীর প্রত্যেক অলিগলির সহিত পরিচিত। কিন্তু কেদারনাথ বা বদরীনাথ এখনও দুর্গম। সুতরাং অনেকেই ইচ্ছা করিলেও সাহস করিয়া এপথে বাহির হন না। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ৺কেদারনাথ ও ৺বদরীনাথ দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিলে বন্ধুগণ অনেকেই পথের কথা শুনিতে চাহেন। পূজ্যপাদ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল, ও শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ বি, এল, মহোদয়গণের আগ্রহে তাঁহাদের নিকট এ বিষয় গল্প করি। তাঁহারা গল্প শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া এই বৃত্তান্তটি সাধারণের নিকট প্রচার করিতে বলেন। তাঁহাদের ইচ্ছানুসারেই এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল। ইহাতে এই দুর্গম প্রদেশে আমরা যেমন করিয়া গিয়াছি তাহাই যথাসাধ্য সরলভাবে বর্ণনা করিয়াছি। আমি কবি নহি, সাহিত্যিক নহি সুতরাং পাঠকগণ আমার এই পুস্তকে ভাষার লালিত্য বা পারিপাট্য দেখিতে পাইবেন না। আমি কল্পনার সাহায্যে কোন বিষয় অতিরঞ্জিত করিতে চেষ্টা করি নাই বরং অনেক স্থলে ক্ষমতার অভাবে অনেক কথা ভাল করিয়া বুঝাইতে পারি নাই। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি পড়িয়া যদি কাহারও হৃদয়ে এই পবিত্র তীর্থসকল দর্শনের স্পৃহা বলবতী হয়, অথবা পথের কথা জানিয়া কেহ কোন উপকার প্রাপ্ত হন আমার সকল পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে মনে করিব।

পুস্তকখানি লিখিবার সময় Garhwal District Gazetteer হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। মুদ্রাঙ্কণের সময় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরিধন কুণ্ডু ও শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সোম বি, এল, অনেক সাহায্য করিয়াছেন। আমি তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

৺কেদারনাথের পাণ্ডা শ্রীযুক্ত তুলসীরাম উমাশঙ্কর ও ৺বদরীনাথের পাণ্ডা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণভট্ট কৃপা করিয়া আমাদের ভগবান দর্শনের যে সহায়তা করিয়াছিলেন ও যেরূপ যত্নের সহিত আমাদিগকে রাখিয়াছিলেন তাহা জীবনে কখন ভুলিব না।

২৩৩নং পঞ্চাননতলা রোড,
হাওড়া।
১লা আষাঢ়, ১৩২৮।

শ্রীবীরেশচন্দ্র দাস।

সূচীপত্র।

কেদার ।

কেদার বদরীর পথে

কেদার।

---

(১)

হরিদ্বার।

দেবাদিদেব মহাদেবের অনুকম্পায় আজ আমার অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা বুঝি ফলবতী হইতে চলিল। যে দেবভূমির কথা লোক মুখে শুনিয়া তাহা দেখিবার জন্ত কতদিন কতই না ব্যাকুলতা অনুভব করিয়াছি, কালিদাস প্রভৃতি মহা মহা কবিগণের লেখনী প্রসূত কাব্যসকল যে পুণ্যভূমির কত মনোহর চিত্র কতবার নয়নসম্মুখে ধরিয়া হৃদয়ে কতই আনন্দরস ঢালিয়া দিয়াছে—সেই লোকোত্তর দেবভূমির অনন্ত সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার কত বাসনা মনে জাগাইয়া তুলিয়াছে, আজ পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ পূর্ব্বাপর সাগরাবগাহী দেবতাত্মা সেই নগাধিরাজ বুঝি আমাকে সত্যসত্যই দেখা দিবেন।

কেদার বদরীর পথে।

হৃদয়ে নিত্য যে সকল আশার উদয় হয়, তাহাদের অধিকাংশ অচিরে জলবুদ্বুদের ন্যায় হৃদয়েই বিলীন হইয়া যায়। জীবনে কত আশা, কত কল্পনা করিয়াছি—কত আশা কত কল্পনা গড়িয়াছি, আবার পরক্ষণেই ভাঙ্গিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই। কি জানি কেন আজ ৺ কেদারনাথ ও ৺ বদরীনাথ এ অধমকে ডাক দিয়াছেন। আজ অনেক দিনের আশা, অনেক দিনের কল্পনা বুঝি বা সফল হইতে চলিল। শরীর রুগ্ন। সম্প্রতি রোগে ভুগিয়া এখনও দেহে যথেষ্ট বল পাই নাই। আত্মীয় স্বজন সকলেই, এমন কি শ্রীমান সুরেশ ভায়াও নিষেধ করিলেন কিন্তু ভগবানের নিয়োগ। ৺ কেদারনাথ ও ৺ বদরীনাথের ডাক আমায় হৃদয়ে এমন একটা ব্যাকুলতা জন্মাইয়া দিল, যে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া যষ্টির উপর ভর দিয়াই গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

১৩২৬ সালের ২০শে বৈশাখ শনিবার শুক্লা চতুর্থী—আমার জীবনের একটি শুভদিন। যে কয়টা দিন এই দুর্ব্বহ জীবনভার বহন করিব, এই শুভদিনের কথা কখনও ভুলিব না। দিবা ১টার সময় যে একখানি এক্‌সপ্রেস গাড়ি হাওড়া ষ্টেশন হইতে ছাড়ে তাহাতেই যাত্রা করিব স্থির করিয়া, অতি প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগের পর হইতে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। কলের মত সমস্ত কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিলাম। মঙ্গল ঘট প্রণাম করিয়া মাতৃদেবীর চরণ বন্দনা পূর্ব্বক বাহির হইলাম। পিতৃদেব এক্ষণে স্বর্গে, তাঁহার চরণ বন্দনা আর ভাগ্যে ঘটিলনা। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলাম। মাতাঠাকুরাণী, দিদিঠাকুরাণী, ও ছোট ভায়া শ্রীমান খগেশ চন্দ্র সঙ্গী হইলেন। বাহির হইয়া বন্ধুবর শ্রীযুক্ত

শ্রীশানন্দ ভায়ার দর্শন পাইলাম। তিনি অধমকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে যথারীতি প্রণাম করিয়া ১০টা ২০ মিনিটের সময় ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

যথা সময়ে ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। ভায়াকে টিকিট ক্রয় করিবার ভার দিয়া সোদর-প্রতিম শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র ভায়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইলাম। মাতাঠাকুরাণী যাইতেছেন শুনিয়া জ্ঞানেন্দ্র ভায়া তাড়াতাড়ি বিশ্রামকক্ষে (waiting room) আসিলেন। ভায়া তখনও টিকিটের জন্য টিকিট দরজায় দাঁড়াইয়া, তখনও টিকিট পান নাই। মেম-সাহেব এখন হইবে না বলিয়া জবাব দিয়াছেন। একের পর এক সকলেই টিকিট পাইতেছেন, কিন্তু ভায়ার ভাগ্যে মিলিতেছেনা। অবশেষে বোঝা গেল মেম সাহেব ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলের ষ্টেশন গুলির জন্য টিকিট দিতে কোন আপত্তি করিতেছেন না। কিন্তু অন্য রেলের কোন ষ্টেশনের জন্য টিকিট চাহিলেই দাঁড় করাইয়া রাখিতেছেন। অগত্যা জ্ঞানেন্দ্র ভায়াকে টিকিট দরজায় উপস্থিত হইতে হইল। টিকিট পাইয়া মাতাঠাকুরাণী ও দিদিঠাকুরাণীকে স্ত্রীলোকের জন্য নির্দ্দিষ্ট কামরাতে বসাইয়া দিয়া আমরা অপর একটি কামরা দখল করিলাম। ক্রমে ক্রমে কামরাটি পূর্ণ হইয়া গেল। দুই চারিজনের বেঞ্চে বসিবার স্থান মিলিল না। তাঁহারা কোনরূপে যাত্রীদের বাক্সের উপর বসিবার বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। নির্দ্দিষ্ট সময় আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম ১টা বাজিতে ৫মিনিট—টং টং করিয়া আরোহীদিগকে সতর্ক করিবার জন্য ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল। পাঁচ মিনিট পরে পুনরায় গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা হইল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

পুত্র শ্রীমান বাসন্তীকুমার বিদায় দিতে আসিয়াছিল, মাতাঠাকুরাণীর নিকট আশীর্ব্বাদ লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া গাড়ি পূর্ণ বেগে চলিতে লাগিল। প্রথমেই লিলুয়া অতিক্রম করিল। গাড়ি এখানে দাঁড়াইল না। এই লিলুয়া কিছুদিন পূর্ব্বে অসংখ্য বৃক্ষরাজির অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া সাধারণের অপরিচিত সামান্য একটি গ্রাম ছিল, কিন্তু রেলওয়ে কোম্পানীর প্রসাদে এক্ষণে নয়নানন্দদায়ক সৌধ-রাজি-শোভিত একটি পরিপাটী মনোরম নগরে পরিণত হইয়াছে। এখানে (Bengal Humanitarian Association) বঙ্গীয় জীবদয়া প্রসারিণী সভার গোশালা একটী দেখিবার জিনিস। দুগ্ধ সকলেরই নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তু। খাদ্যাদির মূল্যাধিক্য এবং বসতবাটীর মধ্যে গোশালার স্থানাভাব বশতঃ অধুনা কলিকাতায় কিম্বা সহরতলিতে গরু রাখা মধ্যবিত্ত লোকদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। গোয়ালার দুধ আদৌ স্বাস্থ্যকর নহে। এই রূপে কলিকাতা অঞ্চলে সম্প্রতি বিশুদ্ধ দুগ্ধের নিতান্ত অভাব হইয়া পড়িয়াছে। বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব শিশুদিগের অকাল মৃত্যুর অন্যতম কারণ, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। ভাল দুগ্ধ পাইতে হইলে গরুর স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। গাভীগণের স্বাস্থ্য, খাদ্য এবং বাতাসের বিশুদ্ধতার উপর অনেকটা নির্ভর করে। খোলা জায়গায় বেড়াইতে না পাইলে গরুদিগকে সুস্থ রাখা একেবারেই অসম্ভব। এই জন্য পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রামে গোচারণের ভূমি ছিল। কিন্তু এক্ষণে জীবনসংগ্রামে সেই সব গোচর লুপ্ত হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে পূর্ব্বের ন্যায় গোচারণের মাঠ আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সামান্য লাভের প্রত্যাশায় আমরা নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারিয়াছি। প্রাণীসকল মনের আনন্দে

স্বচ্ছন্দভাবে আর বেড়াইতে পায় না। নব নব তৃণ আর তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না। শুষ্ক খড়ে তাহাদের উদর পূরণ করিতে হয়। অগত্যা দুগ্ধের পরিমাণ হ্রাস হইয়া যাইতেছে। এই অভাব দূরীকরণ বঙ্গীয় জীবদয়া প্রসারিণী সভার মুখ্য উদ্দেশ্য। দুগ্ধ বন্ধ হইলে সহরে গরু রাখা বড়ই ক্ষতিকর। বঙ্গীয় জীবদয়া প্রসারিণী সভা এখানে গোচারণ মাঠের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। যে সকল গাভী দুগ্ধ দেওয়া বন্ধ করিয়াছে এই সভা তাহাদিগের ভার লইয়া থাকেন। সামান্য মাত্র খরচ লইয়া সেই সব গাভী ইহাদের গোশালায় রাখিয়া থাকেন। দিবাভাগে গাভীসকল স্বচ্ছন্দে মাঠে চরিয়া বেড়ায়। রাত্রিতে সভার বড় বড় আটচালাতে আশ্রয় ও প্রচুর স্বাস্থ্যকর খাদ্য পাইয়া থাকে। হৃষ্টপুষ্ট বৃষেরও বন্দোবস্ত আছে। প্রসব হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে মালিকদিগের ইচ্ছা অনুসারে সভ্যগণ তাহাদিগের স্ব স্ব গাভীগুলি ফিরাইয়া দেন। ইহাতে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের যে কত সুবিধা হইয়াছে তাহা বলা যায় না। এইরূপ সভা গ্রামে গ্রামে হওয়া উচিত।

আমরা লেলুয়া বেলুড় অতিক্রম করিয়া হাওড়া-বর্দ্ধমান নূতন কর্ড লাইনে পড়িলাম। গাড়ী কোথাও থামিতেছে না, দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। গ্রামের পর গ্রাম, প্রান্তরের পর প্রান্তর অতিক্রম করিয়া তারকেশ্বর রেলপথের নিম্ন দিয়া আমরা শেষে শক্তিগড় রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট প্রধান রেলপথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বর্দ্ধমানে গাড়ী থামিলে কিছু মিহিদানা ও সীতাভোগ সংগ্রহ করিয়া লইলাম।

বর্দ্ধমান ছাড়িয়া রাণীগঞ্জ, এসেন্সোল প্রভৃতি কয়লার খনিপ্রধান স্থানের উপর দিয়া দূর হইতে খনিগুলির বাহিরের মূর্ত্তি এবং বড় বড়

চিম্‌নি ও কয়লা তুলিবার যন্ত্রগুলির চেহারা দেখিতে দেখিতে সীতারামপুর পশ্চাতে রাখিয়া গ্র্যাণ্ড কর্ডে প্রবেশ করিলাম। সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমন করিয়াছেন। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। কিছু পূর্ব্বে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মাঠ ঘাট সবই অন্ধকারময়। গাড়ীতে তখনও আলো দেওয়া হয় নাই। গাড়ীর অভ্যন্তর অন্ধকারময়। এইরূপ অবস্থায় ধানবাদ ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ধানবাদ একটি বড় ষ্টেশন। রেলওয়ে কোম্পানির অনুগ্রহে ধানবাদ সহরে পরিণত হইয়াছে। এখানে গাড়ীতে আলো দেওয়া হইল। সকলেই প্রফুল্ল হইলেন। সুবিধামত শয়ন করিবার মত একটু স্থান করিয়া লইলাম। কিঞ্চিৎ জলযোগের পরে নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় পাইলাম। গাড়ী ছুটিতেছে। পরেশনাথ পাহাড়ের পাশ দিয়া ছোট নাগপুর মালভূমি পার হইয়া গুজিয়াণ্ডির সন্নিকট দুই একটি সুড়ঙ্গ (টনেল) ভেদ করিয়া রাত্রি অনুমান দুইটার সময় গাড়ি গয়া ষ্টেশনে দাঁড়াইল। আরও দুই একটা ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া গাড়ি যখন কুদ্রা ষ্টেশনে পৌঁছিল তখন পূর্ব্ব দিক পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হইয়াছে। মোগল সরাই ষ্টেশনে পৌঁছিতে প্রায় সাড়ে সাতটা হইল।

গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। এখানে গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। তাড়াতাড়ি সকলে স্নান করিয়া লইলেন। খরমুজা, পেড়া খাইয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া আউদ রোহিলখণ্ড রেলের মেল ট্রেণে আশ্রয় লওয়া গেল। গাড়ীগুলি পরিষ্কার। ভিড় কম। ৯টা ১৫ মিনিটে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। পুণ্যতোয়া জাহ্নবীর উপরিস্থিত লৌহময় সেতু হইতে ৺বারাণসী ধামের পবিত্র দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ভাগিরথী পার হইলাম। গাড়ী বারাণসী কেণ্টন্‌মেণ্ট ষ্টেশনে পৌঁছিলে দুই এক জন যাত্রী আমাদের গাড়ীতে আসিলেন। ক্রমে প্রতাপগড়, রায়বেরেলি,

লক্ষ্ণৌ, সাজাহানপুর মুরাদাবাদ প্রভৃতি যুক্ত প্রদেশের প্রধান প্রধান সহরগুলি অতিক্রম করিয়া রাত্রি অনুমান ২॥০ ঘটিকার সময় লক্‌সর জংসনে গাড়ি হইতে অবতরণ করিলাম। এখানে হরিদ্বারাভিমুখী অন্য একখানি গাড়িতে উঠিতে হইবে। গাড়ী সম্মুখের প্লাটফর্ম্মেই অপেক্ষা করিতেছিল। একটি কামরায় আমরা সকলে উঠিলাম। এখানেও ভিড় কম। লক্‌সর হইতে যাত্রা করিয়া ২২শে বৈশাখ অতি প্রত্যূষে হরিদ্বার ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। এখানে বেশ শীত অনুভূত হইল। ষ্টেশনটী অন্ধকারময়। আলোর বন্দোবস্ত নাই। গাড়ী হইতে নামিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিলাম আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত তারাচাঁদ দাঁড়াইয়া। তারাচাঁদ ৬ কেদার নাথের একজন পাণ্ডার কর্ম্মচারী। বৎসর খানেক পূর্ব্বে তাঁহার সহিত আলাপ হইয়াছিল, তাঁহার মুখে ৬ কেদারনাথ ও ৬ বদরীনাথ সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া মনে বড় আনন্দ হইল, হৃদয়ে যেন বল পাইলাম, ভাবিলাম ভগবানের দয়া অসীম। এই দুর্গম প্রদেশে কে পথ দেখাইবে সময়ে সময়ে এইরূপ একটা ভাবনা মনের মধ্যে উঠিতেছিল। এতক্ষণ বুঝিতে পারি নাই, ভগবান তাহার বন্দোবস্ত অনেক আগেই করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার কৃপা ব্যতিরেকে মানুষ যে এক পাও অগ্রসর হইতে পারে না ইহা আমরা অনেক সময়েই ভুলিয়া যাই। আমরা ভুলিলেও তিনি তো একদিনের জন্যও ভুলেন না। তারাচাঁদকে দেখিয়া ভগবানের অসীম করুণার কথা স্মরণ করিয়া বলিলাম, প্রভো কি সম্পদে কি বিপদে যখনই পথ ভুলিয়া যাই তখনই যেন আপনার ইঙ্গিতে সুপথ চিনিয়া লইবার সুযোগ পাই।

দুইখানি অশ্বযান ঠিক করা হইল। নিদ্রিত সহরের মধ্য দিয়া কুলু কুলুনাদিনী পুণ্যতোয়া সুরধুনী তটে উপস্থিত হইলাম। সমস্তই নিস্তব্ধ।

সকলেই নিদ্রামগ্ন। রাস্তায় লোক জন নাই। পূর্ব্বপরিচিত শ্রীযুক্ত প্রতাপ পাণ্ডা সানন্দে আমাদিগকে একখনি ঘর দেখাইয়া দিলেন। ঘরটি ঠিক গঙ্গার উপরেই। গঙ্গার সুশীতল সমীরণে আমাদিগের ক্লান্তি যেন একেবারেই দূরীভূত হইয়া গেল। আমরা যেন নূতন জীবন লাভ করিলাম। পূর্ব্বদিক ক্রমে ক্রমে পরিষ্কৃত হইয়া আসিল। পক্ষী সকল নিজ নিজ কুলায় ত্যাগ করিয়া আহার অন্বেষণে বাহির হইল। দিনমণি যেন সকলকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"। সে ডাক আমরা সকলে বুঝি না, সে ডাক আমরা সকলে শুনিতে পাই না। আমরা জ্যোতির্ম্ময়ের অনন্ত বিকীর্ণ জ্যোতিরাশিতে নিমজ্জিত থাকিয়াও মোহনিদ্রাভিভূত হইয়া তাঁহার সন্ধান পাই না। জ্যোতিঃপুঞ্জ মধ্যে ওতঃপ্লুত হইয়াও ঘোর অন্ধকারের বিভীষিকা দেখিয়া থাকি। আমরা জড়ের ন্যায় নিশ্চেষ্ট। পঙ্কিল হ্রদে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছি। আমাদিগের সে উদ্যম নাই, সে সাহস নাই যে ক্ষণেকের নিমিত্ত গা ঝাড়া দিয়া উঠিবার চেষ্টা করি।

স্নান করিবার জন্য সকলে বাহির হইলাম। গঙ্গার স্বচ্ছ নীল জল দেখিতে দেখিতে স্নানঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা, বুঝি বরফ অপেক্ষাও ঠাণ্ডা। হাত যেন কাটিয়া লইতেছে। শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন অবগাহন স্নান ভাগ্যে ঘটিল না। সোপানের উপর বসিয়া গাত্র, মস্তক পবিত্র জলে ধৌত করিয়া লইলাম। শরীর স্নিগ্ধ হইল। নির্ম্মল জলে অসংখ্য বড় বড় মৎস্যের স্বচ্ছন্দ বিহার দেখিতে বড়ই সুন্দর। সোপান শ্রেণীর উপরিস্থিত দেব দেবী সকলকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম। মধ্যাহ্ন আহারের বন্দোবস্ত হইতে লাগিল। হরিদ্বার একটি ছোট খাট সহর। এখানে কিছুরই অভাব নাই।

তারাচাঁদ আসিয়া উপস্থিত। কিরূপে যাইতে হইবে তাহার কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। ৺কেদার নাথ ও বদরীনাথ যাইতে হইলে আমাদের দেশের মত পাল্কী, ডুলি, গোশকট বা অশ্বযান প্রভৃতি কোন প্রকার যান পাওয়া যায় না। তৎপরিবর্ত্তে কাণ্ডি, ঝাঁপান, ও দাণ্ডি প্রভৃতি যানের প্রচলন আছে। অশ্বারোহনেও যাওয়া যায়। ঐ সকল যানাদি এখানে কিম্বা হৃষিকেশে পাওয়া যায়। সঙ্গের জিনিষ পত্র বহন করিবার জন্ম কুলিও এই সব স্থানে সকল সময়ে উপস্থিত থাকে। কাণ্ডী এক প্রকার ঝুড়ি। ইহা একজন কাণ্ডীওয়ালা পৃষ্ঠে বহন করে। আরোহীকে সেই ঝুড়িতে বসিতে হয়। ঝাঁপান বসিবার উপযোগী একটি খাটুলি মাত্র। বাঁশ ও দড়িতে নির্ম্মিত, চারি জনে বহন করে। দাণ্ডি বসিবার চেয়ারের মত, ইহাও চারিজনে বহন করিয়া থাকে। ইহাদের পারিশ্রমিকের কোন বাঁধাবাঁধি হার নাই। সময় সময় হারের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। কাণ্ডি-ওয়ালারা ৪০ হইতে ৬০ টাকা পর্য্যন্ত চাহিয়া থাকে। ঝাঁপানিওয়ালারা চারি জনে ১২০ হইতে ২০০ টাকা পর্য্যন্ত চাহিতে কুণ্ঠিত হয় না। দাণ্ডি-ওয়ালাদের দাবী ঝাঁপানওয়ালাদিগের মত। তবে দাণ্ডিটি ক্রয় করিতে হয়। ইহার মূল্য ২৫৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা। ভার বহনকারীদিগের পারিশ্রমিক এক্ষণে মণ করা ৪৫৲। ইহারা হরিদ্বার হইতে রওনা হইয়া কেদারনাথ ও বদরীনাথ দর্শন করাইয়া গাড়োয়াল জেলার প্রান্তসীমায় মেহেলচৌরি নামক স্থানে পৌঁছাইয়া দেয়। গাড়োয়ালী কুলিরা গাড়োয়াল জেলা ছাড়িয়া অন্য জেলায় যাইতে চায় না। অন্য জেলার জল হাওয়া তাহাদের সহ্য হয় না। মেহেলচৌরি হইতে ৭০ মাইল দূরস্থিত রামনগর রেলওয়ে ষ্টেশনে যাইবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হয়। যাত্রীরা হরিদ্বারে আর ফিরিয়া আসে না। অন্য রাস্তা ধরিয়া রামনগর

ষ্টেশনে রেল ধরে। উল্লিখিত পারিশ্রমিক ব্যতীত ঝাঁপানিরা চারি জনে দৈনিক এক আনা হিসাবে জল খাওয়া ও খিচুড়ি বাবদে ১২ সের চাউলের দাম লইয়া থাকে, ত্রিযুগী নারায়ণে ১৲ বদরী নারায়ণে ১৲ টাকা ও কেদারনাথে ২৲ টাকা মোট চারি টাকা করিয়া ইনাম লইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন কোন স্থানে এক রাত্রির বেশী থাকিতে হইলে প্রত্যেকে একসের করিয়া চাউল লইয়া থাকে। ভারবহন কুলীরাও ঐরূপ পাইয়া থাকে।

তারাচাঁদের কৃপায় আমাদিগের যাইবার সম্বন্ধে সমুদায় বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল। শঙ্কর আমাদিগের পথ প্রদর্শক হইলেন। শঙ্কর একজন কর্ম্মঠ বিশ্বাসী গাড়োয়ালী। এই অপরিচিত দুর্গম স্থানে তাহার নিকট আমরা অশেষরূপে উপকার পাইয়াছি। নিজের কষ্টকে তুচ্ছ করিয়া তিনি আমাদিগের সেবায় সর্ব্বদা যত্নবান থাকিতেন। যখন যাহা করিতে বলা হইয়াছে শঙ্কর সহাস্য বদনে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিয়াছেন তাহার হাসিমুখ কখন ভুলিবার নয়। কল্য প্রাতে আমাদিগের হরিদ্বার হইতে যাত্রা করা স্থির হইল। মধ্যাহ্ন আহার সম্পন্ন করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর সহর দেখিতে বাহির হইলাম।

হরিদ্বার সাহারানপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ নগর। গঙ্গার দক্ষিণ তটে এবং শিবালিক নামক গিরিশ্রেণীর পাদদেশে অতি মনোরম স্থানে অবস্থিত। এই স্থানে পর্ব্বত ভেদ করিয়া পতিতোদ্ধারিণী ভাগিরথী পাপিজনের উদ্ধারের জন্য সমতল ভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন। হরিদ্বারের অনেকগুলি নাম আছে। মহর্ষি কপিলের আশ্রম বলিয়া ইহার একটি নাম "কাপিল"। মহর্ষির আশ্রম স্থান একণে "কপিলস্থান" বলিয়া অভিহিত। কেহ কেহ তৈমুরের "কুটিল" ও "কপিল" একই বলিয়া মনে করেন। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা ইহাকে "গঙ্গা-দ্বার" বলিয়া জানেন। অনুমান

সপ্তম শতাব্দী হইতে এই নাম প্রচলিত আছে। প্রসিদ্ধ চীন পরিব্রাজক হিউন সাঙ্গের ভ্রমণ বৃত্তান্তে "মায়াপুরের" উল্লেখ আছে। ইহা বর্ত্তমান সহরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। বর্ত্তমান নামেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। শৈবেরা ইহাকে "হরদ্বার" ও বৈষ্ণবেরা "হরিদ্বার" বলিয়া থাকেন। মোগল সম্রাট আকবরের সময় এখানে তাম্রমুদ্রা প্রস্তুত করিবার একটি কারখানা ছিল; এবং অনেকে বলেন যে তিনি হরিদ্বারের জল ব্যবহার করিতেন।

যে গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়া গঙ্গা সমতলক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন তাহার সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্কীর্ণ স্থান প্রস্থে প্রায় ১ মাইল। গঙ্গা বহু শাখায় বিভক্ত। প্রধান স্রোত নীলধারা নামে অভিহিত। একটী বড় শাখা সহরের প্রায় ২ মাইল উত্তরে বাহির হইয়া হরিদ্বারের নিম্ন দিয়া কণখলে পুনরায় প্রধান স্রোতের সহিত মিশিয়াছে। হরিদ্বারের শ্রেণীবদ্ধ ঘাট ও মন্দির গুলির দৃশ্য অতীব মনোহর।

উত্তর হইতে আরম্ভ করিয়া তীর্থের মধ্যে প্রথম "ভীমগোড়া" কুণ্ড। ইহা একটি খাড়া পাহাড়ের ঠিক পাদদেশে অবস্থিত। গঙ্গার একটি ক্ষুদ্র শাখার জলে কুণ্ডটি পূর্ণ হইয়া থাকে। গঙ্গা যখন সমতল ভূমিতে অবতরণ করেন তখন তাঁহাকে পথ দেখাইবার জন্য মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন আদিষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার ঘোড়ার পদাঘাতে পাহাড়ের উপর একটি গর্ত্ত উৎপন্ন হয়। এই গর্ত্তই কালে "ভীমগোড়া" নামে অভিহিত হইয়াছে—এইরূপ প্রবাদ, কিন্তু প্রবাদটী নিতান্তই অসঙ্গত। ইহার দক্ষিণে, নগরের মধ্যে একটি ছোট মন্দিরে "ব্রহ্মকুণ্ড"। ব্রহ্মকুণ্ডের লাগাও দক্ষিণে "হর-কি-পাইরি" নামক বিখ্যাত স্নানঘাট। পাণ্ডারা এই ঘাটের দেওয়ালে একখণ্ড প্রস্তরে বিষ্ণুর পদ চিহ্ন দেখাইয়া থাকেন।

হরিদ্বারে যতগুলি পবিত্র স্থান আছে তাহাদের মধ্যে এই ঘাটই পবিত্রতম। পূর্ব্বে ইহা ৩৪ ফিট প্রশস্ত ছিল, এবং ইহাতে ৩৯টি ধাপ ছিল। পবিত্র মুহূর্ত্তে সকলেই স্নান করিবার জন্য লালায়িত অথচ ঘাট সঙ্কীর্ণ, বিপুল জনসঙ্ঘের স্থান সঙ্কুলান হইত না। সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ ১৮২০ খৃষ্টাব্দে স্নানের সময় ৪৩০ জন লোক পেশা-পেশীতে মারা যায়। বস্তুতঃ সময়ে সময়ে জলনিমজ্জনে যাত্রীরা মারা যাইত। এই সকল কারণে সরকার কর্ত্তৃক ঘাটটি ১০০ ফিট চওড়া করা হইয়াছে, এবং ধাপের সংখ্যাও ৬০টি হইয়াছে। কুণ্ডের তলদেশ ইষ্টকঃ দিয়া বাঁধান। স্রোতের জল যাহাতে কুণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুনরায় বাহির হইয়া যাইতে পারে তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহাতে যাত্রীরা স্রোতের বেগে ভাসিয়া না যায় তজ্জন্য একটি লোহার বেড়া দেওয়া হইয়াছে। কুণ্ড হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূর পর্য্যন্ত গঙ্গার তীর ইষ্টক দিয়া বাঁধান। কুণ্ডের পার্শ্বে একটি চড়া। তাহাও তদ্রূপ বাঁধান। একটি পুল দিয়াঃ এই চড়ায় যাইতে হয়। এখান হইতে চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতি মনোহর। গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি ও সুশীতল সমীরণে শরীর পুলকিত হয়। কুণ্ডের পার্শ্বে "গঙ্গাদ্বার" মন্দির। অসংখ্য যাত্রী ইহা দর্শন করিবার জন্য নানা দেশ হইতে সমাগত হন। পুরাকালে সমবেত গোঁসাই ও বৈরাগীদিগের মারামারির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে কাহারা অগ্রে স্নান করিবে এই লইয়া একটি ছোট খাট লড়াই হইয়াছিল। শোনা যায় এই বিবাদে ১৮০০ লোক নিহত হয়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে শিখ যাত্রীরা ৫০০ গোঁসাইকে নিহত করে। ১৮৯৮ সালেও একটি দাঙ্গা হইয়াছিল। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তৈমুর কর্ত্তৃক এখানে একটি ভীষণ হত্যাকাণ্ড সাধিত হইয়াছিল। "গঙ্গাদ্বারের" দক্ষিণে "শ্রবনাথের"

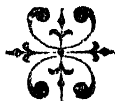
মন্দির পর্যন্ত ক্রমাগত মন্দির ও মঠের একটি শ্রেণী আছে। স্বরনাথের মন্দির "ললিতারাউ" ও "গঙ্গার" সঙ্গম স্থলে অবস্থিত।

ইহার দক্ষিণে মায়াপুর। মায়াপুরে পুলিশ ষ্টেশন, ডিস্পেন্সারি ও ডাক বাঙ্গালা আছে। গণেশ ঘাটের নিম্নে খালের মুখ। খালের উপরে আফিস ও পরিদর্শন বাঙ্গালা। এই স্থান হইতে সহর, গঙ্গা ও পর্ব্বত মালার দৃশ্য বড়ই সুন্দর। কানিংহাম সাহেবের মতে মায়াপুর একটি প্রাচীন স্থান। খালের পুলের ঠিক বিপরীতদিকে পাথরের ও ইটের একটি স্তুপ দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তরে ভৈরব ও মায়াদেবীর মন্দির। ইহার দক্ষিণ পশ্চিমে নারায়ণ বাটি। নিকটেই বান রাজার দুর্গের ভগ্নাবশেষ।

মায়াপুর খালের মুখ হইতে প্রায় ১ মাইল দক্ষিণে কন্‌খল সহর। সহরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, চারিদিকে সুন্দর সুন্দর মন্দির, মধ্যে মধ্যে সুন্দর সুন্দর তোরণ শোভিত উদ্যান। সহরের মধ্যে একটি পাথর বাঁধান পরিপাটী রাজপথ। ঐ রাজপথের দুই পার্শ্বে সারি সারি দোকান ও বড় বড় অট্টালিকা। কন্‌খলে যতগুলি মন্দির আছে তন্মধ্যে দক্ষেশ্বর মহাদেবের মন্দির সর্ব্বপ্রধান। প্রবাদ এই স্থানে মহাদেব দক্ষরাজার যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়াছিলেন। এই স্থানেই সতী পতিনিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করেন। মন্দিরটি একটি চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণ মধ্যে অবস্থিত। আধুনিক অট্টালিকাগুলির মধ্যে লন্ধৌরার রাজার দেবালয় ও সত্রখাটি উল্লেখ যোগ্য।

হরিদ্বারের ঠিক অপর পারে নীল ধারা ও গঙ্গার প্রধান প্রবাহে পরিবেষ্টিত একটি দ্বীপ আছে। এই দ্বীপ হইতে নীলধারা পার হইলে "চণ্ডীপাহাড়"। চণ্ডীপাহাড়ের একটী চূড়ার উপর ৺ চণ্ডী দেবীর

মন্দির। অপর একটি চূড়ায় অঞ্জনা দেবীর মন্দির। চণ্ডীপাহাড়ের চূড়াদেশ হইতে চতুর্দ্দিকস্থ জনপদের দৃশ্য অতীব মনোরম। নিম্নে গঙ্গার ভিন্ন ভিন্ন স্রোত নীল ফিতার মত পর্ব্বতের পাদদেশ বেষ্টন করিয়া দূরে কোথায় গিয়া মিশিয়াছে। ওদিকে পর্ব্বতের উপরি পর্ব্বত উঠিয়া তরঙ্গভঙ্গে আকাশের গায়ে গিয়া ঠেকিয়াছে।



(২৬)

লছ্‌মন ঝোলা।

হরিদ্বার হইতে সত্যনারায়ণ—৭ মাইল।
,, ,, হৃষিকেশ—১৪ মাইল।
,, ,, লছমন ঝোলা—১৭ মাইল।

২৩ বৈশাখ মঙ্গলবার। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া যাত্রা করিলাম। তারাচাঁদ দুইখানি গাড়ী ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। গঙ্গার ধারে ধারে পর্ব্বতের নিম্নদেশ দিয়া আমাদিগের রাস্তা। ক্রমে ভীমগোড়ায় পৌঁছিলাম। কুণ্ডটি অসংখ্য নরনারীতে পূর্ণ। সকলেই অবগাহনে নিরত। ব্যোম ব্যোম হর হর শব্দে চারিদিক মুখরিত। ক্রমে গঙ্গা স্রোত আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতে লাগিল। রাস্তাটি গঙ্গার কিনারা হইতে সরিয়া পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া যাইতে লাগিল। ঘন নিবিষ্ট বৃক্ষরাজির মধ্য দিয়া কখন দেরাদুন রেলপথের ধার দিয়া কখন তাহার উপর দিয়া আমরা যাইতে লাগিলাম। সারিবদ্ধ বৃক্ষ। কে যেন সেগুলিকে সাজাইয়া রোপণ করিয়া রাখিয়াছে। প্রাতঃ সমীরণে দেহ প্রাণ পুলকিত হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি-নদী অতিক্রম করিলাম। এখন এগুলি পার হইতে কোন কষ্ট নাই। সকলগুলিরই উপর পুল হইয়াছে। তন্মধ্যে রায় বাহাদুর সুরজমলের ব্যয়ে নির্ম্মিত সৌম নদীর উপর পুলটী উল্লেখযোগ্য। রাস্তাও পরিষ্কার। ক্রমে ৺ সত্যনারায়ণ দেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এখানে ধর্ম্মশালা

আছে—সাধু সন্ন্যাসীরা সিধা পাইয়া থাকেন। ৺ সত্যনারায়ণ ও ৺ লক্ষ্মী দেবীকে দর্শন করিয়া প্রায় ১০টা ১১টার সময় ৺ হৃষিকেশে পৌঁছিলাম।

হৃষিকেশ গঙ্গার তীরের ঠিক উপরেই অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি ধর্ম্মশালা আছে। স্থানটি সাধু সন্ন্যাসীতে পরিপূর্ণ, পরম রমণীয় তপোভূমি। ত্রিবেণীঘাট এখানকার একটি পবিত্র তীর্থ। ঘাটের উপরেই অনেক সাধু অবস্থান করিতেছেন। ইঁহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খড়ের কুঁড়ে ঘরে বাস করেন। এই সকল কুঁড়ের উপর গোল গোল চূড়া। জগাধারি ধর্ম্মশালায় আমরা আশ্রয় পাইলাম। বাজারে সব জিনিষই পাওয়া যায়। আটা।/০ সের ও ঘি ২॥০ টাকা সের।

সকলে ত্রিবেণীঘাটে স্নান করিতে নামিলাম। স্রোতবেগ অত্যন্ত প্রবল। অত্ত অবগাহন স্নানের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। পুণ্য-তোয়া জাহ্নবী নীরে মনের আনন্দে বসিয়া পড়িলাম। জলস্রোত বেগে আসিয়া শরীরে লাগিতেছে। কি আরামদায়ক। শরীরের সমুদায় গ্লানিই বিদূরিত হইল। যদিও জল বরফ অপেক্ষা শীতল তথাপি উঠিয়া আসিতে ইচ্ছা হইল না, অনেকক্ষণ জলে রহিলাম, মনের আনন্দে স্নান সমাপন করিয়া উঠিলাম। সে স্থান হইতে চলিয়া আসিতে যেন মন সরিতেছিল না। ইচ্ছা হয় সমস্ত দিন রাত্রি এইখানে বসিয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখি। জলে মাছের খেলা দেখিবার জিনিস। স্রোত এত প্রখর যে আমরা স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারি না, সর্ব্বদাই ভয় হয় যে স্রোতে বুঝি ভাসাইয়া লইয়া যাইবে, অথচ মাছ গুলি সেই খরস্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া মনের আনন্দে এদিক ওদিক খেলাইয়া বেড়াইতেছে, ভাসিয়া যাইতেছে না। এখানে হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, মৎস্য গুলিকেও হিংসা করিবার কেহ নাই। তাহারা মানুষ দেখিয়া ভয় পায় না। মানুষের নিকট নির্ভীক

চিত্তে খেলা করিয়া বেড়ায়, এমন কি হাত হইতে খাবার জিনিষ লইতেও ভয় পায় না। যাত্রীরা খেলা দেখিবার জন্য নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য জলে ছড়াইয়া দিয়া কৌতুক দেখেন।

ঘাট হইতে উঠিয়া হনুমানজীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলাম। হনুমানজীর মন্দিরের সম্মুখে একটী কুণ্ড আছে তাহাতে স্নান করিয়া পরে গঙ্গা স্নান করিতে হয়। আমাদের বাসাটি ঠিক ঘাটের উপরেই। মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর দেখি যে আমাদিগের রওনা হইবার জন্য সমস্তই প্রস্তুত। অপরাহ্ন দুই ঘটিকার সময় যাত্রা করিলাম। এবার আমরা একটি প্রশস্ত পথ ধরিয়া যাইতে লাগিলাম। রাস্তার দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধ দোকান। কিছু দূর যাইয়া ভরতজীর মন্দির। জনপ্রবাদ এখানে ভরত তপস্যা করিয়াছিলেন। ভরতজীর মন্দির ব্যতীত রাম সীতা প্রভৃতিরও অনেকগুলি মন্দির আছে। কেহ কেহ বলেন এই স্থানে মহর্ষি দ্বৈপায়ন বেদকে চারি-ভাগে বিভক্ত করিয়া বেদব্যাস উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম হিমালয়ের সৌন্দর্য্য ততই অধিকতর ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সম্মুখে একটি বারিশূন্য পার্ব্বতীয় নদীতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। নদীর গর্ভ প্রস্তর খণ্ডে পূর্ণ। নদীর উপর দিকে চাহিয়া দেখি কেবল প্রস্তর খণ্ড। নিম্নের দিকে ফিরিয়া দেখি কেবল প্রস্তর, দূরে—দূরে—সুদূরে পাহাড়ের গায়ে যাইয়া মিশিয়াছে। ঐ নদীর গর্ভ অতিক্রম করিয়া আমরা গঙ্গার গর্ভ দিয়া যাইতে লাগিলাম। রাস্তা উপর দিয়া গিয়াছে। গঙ্গা মনের আনন্দে চারিদিক মুখরিত করিয়া চলিতেছেন। আমরা একটি প্রস্তর হইতে অপর একটি প্রস্তরে পদ বিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলাম। গঙ্গাতীরে অনেকগুলি মন্দির আছে।

পুনরায় রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। অদূরে রেজেষ্ট্রী অফিস। এখানে কুলি ও ঝাঁপানিওয়ালাদের নাম রেজেষ্ট্রী হয়। তাহাদের নাম ধাম ও পারিশ্রমিক লেখা এক ফর্দ্দ কাগজ যাত্রীদিগকে ও আর এক ফর্দ্দ ঝাঁপানিওয়ালাদিগকে দেওয়া হয়। মাল ওজন করিয়া কুলির পারিশ্রমিক স্থির করা হয়। এক ফর্দ্দ যাত্রীর নিকট থাকে আর এক ফর্দ্দ কুলীর নিকট থাকে। আমাদের ঝাঁপানিওয়ালাদের নাম রেজেষ্ট্রী হইল। আমাদের বিছানা ও পরিধেয় বস্ত্রাদি ঝাম্পানে বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। থালা ঘটি ইত্যাদি যাহা কিছু অবশিষ্ট রহিল সেগুলি আমাদের পথ প্রদর্শক পূর্ব্বকথিত শঙ্কর লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি ওজন মত টাকা পাইবেন ঠিক হইল। ইহা তাঁহার বেশী লাভ।

এই স্থান হইতে রওনা হইবার পর স্পষ্টই বোঝা গেল আমরা এখন উঠিতেছি। এইখানে চড়াই আরম্ভ হইল। চড়াই কাহাকে বলে এখানে কতক উপলব্ধি হয়। পাহাড়ে উঠিতে হইলে স্থানে স্থানে পাহাড়ের গা দিয়া খানিকটা উপরে উঠিতে হয়। কোথাও বা খানিকটা সমতল রাস্তাও পাওয়া যায়। ৺ কেদার নাথের রাস্তা পর্ব্বতগাত্রে ক্রমোচ্চ করিয়া কাটিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। কোন নদীর পুলে উঠিতে হইলে যেমন খানিকটা উঠিতে হয় ইহাও তদ্রূপ। তবে উচ্চতার তারতম্য আছে। কোথাও ঠিক খাড়া, কোথাও বা গড়ান। প্রথম প্রথম অভ্যাসের অভাব হেতু চড়াইয়ে উঠিতে বড়ই কষ্ট হয়। বুকে বড় লাগে। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস হইলে তত কষ্ট হয় না। যাহারা পদব্রজে যাইতে চাহেন তাহাদের হাতে একগাছি শক্ত লাঠি রাখা আবশ্যক। হরিদ্বারের বাজারে এক প্রকার লাঠি পাওয়া যায় তাহার অগ্রভাগ সুচালু লৌহ-

শলাকা গ্রথিত। অধিকাংশ যাত্রীরা সেইরূপ লাঠি সংগ্রহ করিয়া রাখেন। বস্তুতঃ যে কোন লাঠিতেই চলে। লাঠিতে ভর দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিলে অনেকটা কষ্টের লাঘব হয়। চড়াই হইতে নামিবার সময় আবার ঐরূপ লাঠিতে ভর দিতে হয়। তখন মনে হয় যেন উপর হইতে কেহ ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিতেছে। গড়গড় করিয়া নামিতে হয়। একটু অসাবধান হইলে মুখ থুবড়াইয়া পড়িবার সম্ভাবনা।

কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই জুতা পরা আবশ্যক। খালি পায়ে চলিলে পাথরের উপর চলিয়া চলিয়া পায়ের তলা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধিকন্তু পাথরে চোট লাগিয়া ক্ষত হইবারও সম্ভাবনা। যদি স্ত্রীলোকেরা চামড়ার জুতা পরিতে একান্ত অসম্মত হন, তাহা হইলে হরিদ্বারে কিম্বা শ্রীনগরে দড়ির তলাবিশিষ্ট ক্যাম্বিসের এক প্রকার জুতা পাওয়া যায়, তাহাই ব্যবহার করিতে পারেন। শীতোপযোগী গরম বস্ত্র সঙ্গে রাখা উচিত। এই সময়ে অপরাহ্নকালে প্রায়ই বৃষ্টি হইয়া থাকে। Water proof coat ও oil cloth সঙ্গে থাকিলে ভাল হয়। এই অঞ্চলে এক প্রকার পোকার কামড়ে সময়ে সময়ে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। চুলকাইয়া চুলকাইয়া গা সমস্ত দগড়া দগড়া হইয়া যায়। ইহাদিগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায়, গায়ের উপরি একটি মলমল জামা পরিধান করা। তাহা হইলে পোকাগুলি কামড়াইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। জামাটি প্রত্যহ গরম জলে ধৌত করিতে হয়। আহার্য্য দ্রব্য ঢাকিয়া রাখিবার জন্য একটি ঢাকনি সঙ্গে লওয়া ভাল। এ অঞ্চলে মাছির উপদ্রব অত্যন্ত বেশী। স্থানে স্থানে এত অধিক যে খাইবার [illegible]গুলি একেবারে ঢাকিয়া ফেলে। কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না।

দেখিতে দেখিতে আমরা লক্ষ্মণজীর মন্দিরে আসিয়া [illegible]ম।

মন্দিরটি একটি উচ্চ চত্বরের উপর নির্ম্মিত। রাবণ বধের পাপক্ষয় মানসে রামচন্দ্র হৃষিকেশে এবং লক্ষ্মণ এই স্থানে উৎকট তপস্যা করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণজীর মন্দির হইতে নামিয়া কিছু নিম্নে কতকগুলি ছোট ছোট মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। পার্শ্বেই গঙ্গার দুরন্ত স্রোত হু হু করিয়া ছুটি-তেছে। এখানে ধ্রুব বা দ্রোণ ঘাট, ও ঘাটের নিম্নে একটি কুণ্ড দেখিবার জিনিষ। নিকটেই প্রসিদ্ধ লছমন ঝোলা। দুই দিকে উচ্চ পাহাড় ও মধ্যে খরস্রোতা জাহ্নবী। লছমন ঝোলা গঙ্গা পার হইবার সেতুমাত্র। কথিত আছে ত্রেতাযুগে লক্ষ্মণদেব এই স্থানে গঙ্গা পার হইবার জন্য দুই গাছি লৌহের শিকল পর্ব্বত মধ্যদেশে ঝুলাইয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান লৌহ সেতু নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে সেতুটি দড়ি নির্ম্মিত ছিল। এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত দুই গাছি দড়ি দুই পার্শ্বে দুইটি করিয়া চারিটি খোঁটাতে আবদ্ধ ছিল। এই দুইটি দড়ি হইতে বিলম্বিত ছোট ছোট বহুসংখ্যক দড়িতে আবদ্ধ এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত সরাসর বিস্তৃত একটি কাঠের মই সেতুর কার্য্য করিত। এরূপ সেতু এখনও যাত্রীপথে অনেক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষণ ঝোলা এক্ষণে সুতার দড়ির পরিবর্ত্তে তারের দড়িতে তৈয়ার হইয়াছে। এই সেতুটি বণিকপ্রবর সুরযমলের অন্যতম কীর্ত্তি। ধর্ম্মাত্মা সুরযমল মাতৃসমভিব্যাহারে বদরিকাশ্রমে যাইতেছিলেন। মাতৃআজ্ঞায় যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য বহু অর্থব্যয়ে এই সেতু নির্ম্মাণ করেন। এই সেতু হইতে ভাগিরথীর প্রচণ্ড স্রোত দেখিলে অন্তরাত্মা একেবারে শুকাইয়া যায়।

গঙ্গার উভয় পার্শ্বে সাধু ও যাত্রীদের জন্য অনেক ধর্ম্মশালা আছে। থাকিবার কোন কষ্ট নাই। সচরাচর প্রয়োজনীয় সকল রকম আহারীয় সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য অনেকগুলি দোকান আছে।

দেবপ্রয়াগ।

লছমন ঝোলা	হইতে	ফুলবাড়ী—৩৸	মাইল।	লছমন ঝোলা	হইতে	মহাদেব—২১।॰	মাইল।
"	"	গুলার—৬	"	"	"	শ্যাম্লল—২৫	"
"	"	মোহন—৯	"	"	"	কাণ্ডি—২৮	"
"	"	ছোট বিজলী—১॰	"	"	"	ব্যাসঘাট—৩২	"
"	"	বড় বিজলী—১১৸	"	"	"	ছালোড়ি—৩৫	"
"	"	কুণ্ড—১৫	"	"	"	উমরাসু—৩৭।॰	"
"	"	বন্দর ভেল—১৮	"	"	"	সৌর—৩৯॥॰	"

লছমন ঝোলা হইতে দেবপ্রয়াগ—৪১ মাইল।

লছমন ঝোলা পার হইয়া আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। দক্ষিণ পার্শ্বে কে যেন পাথর দিয়া আকাশস্পর্শী একটি প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। বাম পার্শ্বে অতি নিম্নে ঠিক যেন পাতাল দিয়া গঙ্গার খরস্রোত কলনাদে সেই নির্জ্জন গিরি সঙ্কট প্রতিধ্বনিত করিয়া তীরবেগে কি জানি কি উদ্দেশ্যে ছুটিয়াছে। গঙ্গার জল যেমন স্বচ্ছ, স্রোত তেমনি প্রবল, মধ্যে মধ্যে উপলখণ্ডে প্রতিহত হইয়া এক বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছে, উৎক্ষিপ্ত বারিকণা রাশি রাশি ফেণপুঞ্জ উদ্গীরণ করিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া দিতেছে। নিরবচ্ছিন্ন মৃদু কুলু কুলু ধ্বনি বজ্র নির্ঘোষে পরিণত হইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। কোমলে কঠোরে, মধুরে ভীষণে, এমন মেশামিশী, এমন কোলাকুলী, বুঝি আর কখন দেখি নাই। উপরে নীলাকাশ, নিম্নে নীলজল, পার্শ্বে পর্ব্বত গাত্রে হরিৎ তরু রাজি। মরি মরি কি

রঙের খেলা। এই রঙের খেলায় বিভোর হইয়া এই অনন্ত সৌন্দর্য্যে প্রাণমন ভাসাইয়া চলিতেছি। যতই অগ্রসর হইতেছি ততই সেই প্রাণমন মাতোয়ারা ছবির রচয়িতাকে মনে পড়িতেছে। প্রভু, আমাকে কি দেখাইলে—ভাবিতে ভাবিতে জানি না কখন আনন্দাশ্রুতে নয়ন ভাসিয়া উঠিল—বলিয়া উঠিলাম হর হর ব্যোম ব্যোম। জয় কেদারনাথ জি কি জয়। সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে অস্তাচলে যাইতেছেন, কিরণজাল গুটাইয়া লইতেছেন, পর্ব্বত গাত্র হইতে সরাইয়া লইয়া পর্ব্বত শৃঙ্গ উদ্ভাসিত করিতেছেন। হঠাৎ পর্ব্বতের ওপার হইতে উকি ঝুঁকি মারিয়া মেঘখণ্ডগুলি আসিয়া নীলাকাশ আবৃত করিয়া ফেলিল। এ এক নূতন দৃশ্য। প্রভু তোমার লীলা বোঝা ভার। এই যে চতুর্দ্দিক হাসিতেছিল সে হাসি কোথায় লুকাল। পবন দেবও কাহার কি জানি এক অশ্রুত ডাকে দৌড়িয়া আসিলেন, আনন্দে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন, বিশাল বৃক্ষরাজির সহিত তাণ্ডব নৃত্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বৃক্ষ সকল এদিক ওদিক হেলিতে দুলিতে লাগিল। এ এক আনন্দের খেলা। মেঘগুলি ক্রমে ক্রমে উপর হইতে নামিয়া আসিল। বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল। আমরা গুটি গুটি যাইতেছি নিম্নে—নিম্নে—অতিনিম্নে খরস্রোতা ভাগিরথী, পার্শ্বে পাহাড়ের আকাশস্পর্শী প্রাচীর, রাস্তা সঙ্কীর্ণ, প্রচণ্ড ঝড়। পবন দেবের বেগ বুঝি বা আর সহ্য করিতে পারি না। বুঝি বা ভাগীরথীনীরে ডুবাইয়া দেয়। এইরূপে ভীষণ বাত্যায় উৎপীড়িত হইয়া, বৃষ্টির জলে অভিসিঞ্চিত হইয়া, প্রকৃতির বিশ্বসংহারক তাণ্ডব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ এইরূপে চলিয়া প্রায় চারি মাইল দূরবর্ত্তী ফুলবাড়ী চটিতে পৌছিলাম। খুব বড় বড় পাঁচ সাত খানা ঘর, ঠিক গঙ্গার উপরে

অবস্থিত। নিকটে অনেক বড় বড় গাছ আছে। চটিওয়ালারা বেশ সজ্জন। এই অঞ্চলে প্রত্যেক চটিতে আহারোপযোগী আটা, ঘি, ডাল প্রভৃতি পাওয়া যায়। ঠিক সন্ধ্যার সময় চটিতে আশ্রয় লইলাম। তখনও আকাশ পরিষ্কার হয় নাই। চটিতে আসিয়া দেখি একটি যুবক বিষণ্ণ চিত্তে গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। তিনি মাতার সঙ্গে আসিতেছিলেন; মাতা আগে আগে আসিতেছিলেন, তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছিলেন। ঝড়ের সময় পরস্পর ছাড়াছাড়ি হইয়াছেন। ভাবিয়াছিলেন যে সন্মুখবর্ত্তী ফুলবাড়ী চটিতে মাতাকে দেখিতে পাইবেন। কিন্তু এখানে আসিয়া তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। রাত্রি আসিয়া পড়িল। কোথায় খুঁজিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না। অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত। কিন্তু সকলে নিষেধ করিতেছেন। অজানিত স্থান, তাহার উপর পথ দুর্গম, সময় সময় রাত্রিতে হিংস্র জন্তুও বাহির হয়। তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত না করিয়া যাইতে উদ্যত। অতিকষ্টে তাহাকে নিবৃত্ত করা গেল। কেহ কেহ বলিল একটি স্ত্রীলোক ঝড়ের সময় ফুলবাড়ী চটিতে না থামিয়া চলিয়া গিয়াছে। সকলেই অনুমান করিলেন তাহার মাতা নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী চটিতে আশ্রয় লইয়াছেন।

চটির ঘরগুলি লম্বা লম্বা। তিন দিক পাথরের দেওয়াল দিয়া ঘেরা। সম্মুখ দিক একেবারে খোলা, কেবল কতকগুলি খুঁটি আছে। খুঁটির উপর চাল। কতকগুলি বড় বড় শ্লেটের মত পাথর চাপান। ঘরের এক পার্শ্বে চটিওয়ালার ঘর; তাহাতে যাত্রিদিগের দরকারী জিনিষপত্র থাকে। চটিতে থাকিতে হইলে চটিওয়ালার নিকট হইতে জিনিষপত্র কিনিতে হয়। ঘর ভাড়ার জন্য কিছুই দিতে হয় না। চটিওয়ালারা যাত্রিদিগকে ঘড়া হাঁড়ি, বাসন প্রভৃতি যোগাইয়া থাকেন, তাহার জন্য তাহারা কিছু

দাবী করে না। আমরা চটিতে পৌছিয়াই আমাদের ভিজা কাপড় পরিত্যাগ করিয়া চটির মধ্যে শুকাইবার জন্ত ছড়াইয়া দিলাম। আমরা ভিজা কাপড়ের জন্ত ব্যস্ত কিন্তু ভায়া আটা, ঘি, ও কাঠের জন্ত ব্যস্ত। চটিওয়ালার সহিত বেশ আলাপ করিয়া তাহাকে নিজের লোক করিয়া লইয়াছেন। তাহার নিকট হইতে আটা, ঘি ও শুষ্ক কাঠ সংগ্রহ করিয়া লুচি করিবার জন্ত প্রস্তুত, সঙ্গে আলু ও মসলা আছে। আটা জাঁতা পেসা। এ অঞ্চলের অধিবাসীরা স্রোতের বেগে জাঁতা চালাইয়া গম পিষিয়া আটা করেন। সে আটা খুব সুস্বাদু। ঘি খুব উৎকৃষ্ট, কোন ভেজাল নাই। শঙ্কর চটিওয়ালার নিকট হইতে একটি ঘড়া লইয়া গঙ্গাজল আনিলেন। জল বেশ নির্ম্মল। মা ও দিদি পাককার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন, ভায়া তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে লাগিলেন—আমার কোন কাজ নাই। তখন আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, সপ্তমীর চন্দ্র দেখা দিয়াছেন, বাহিরে বসিয়া হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে গঙ্গার কুলু কুলু ধ্বনি শুনিতে লাগিলাম। কি মধুর। কর্ণে যেন অমৃত ধারা সিঞ্চিত হইতে লাগিল। ভগবানের অনন্ত রূপ, অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া যেন আত্মহারা হইয়া গেলাম।

এদিকে লুচি ও আলুর দম প্রস্তুত, ভায়ার ডাকাডাকিতে উঠিয়া পড়িলাম। বড়ই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। লুচি আলুর দমে উদর পূর্ণ করিয়া শয়ন করিলাম। কাপড় চোপড়গুলি চারিদিকে ছড়ান রহিয়াছে ঘুমাইয়া পড়িলে পাছে কেহ লইয়া যায়, সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে কখন নিদ্রাদেবীর কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় পাইলাম বলিতে পারি না। চক্ষু খুলিয়া দেখি আলোকে চারিদিক আলোকিত হইয়াছে, বিহঙ্গকুল প্রভাতি আরম্ভ করিয়াছে। শয্যায় আর থাকা উচিত নয় মনে করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। দেখিলাম কাপড় চোপড়গুলি যেখানে ছিল সেইখানেই

আছে। কেহই সরায় নাই। কল্য সন্ধ্যার সময় এক দৃশ্য দেখিয়াছিলাম আজ আর এক দৃশ্য। বিহঙ্গকুলের মধুর কাকলী, সুরধুনির সুমধুর গীত ধ্বনি, পর্ব্বতগাত্রে সূর্য্যরশ্মির অনুপম বর্ণ বৈচিত্র, স্তরে স্তরে সজ্জিত তরুরাজির সুকুমার সৌন্দর্য্য, মনের ভিতর কি একটা ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া দিতেছে।

অদ্য ২৪শে বৈশাখ। প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া যাত্রা করিলাম। গঙ্গা কিছুদূরে সরিয়া পড়িলেন। যাইতে যাইতে পথিপার্শ্বে স্থানে স্থানে পাইপ হইতে অনবরত জল পড়িতেছে দেখিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম পর্ব্বতের উপরিস্থিত ঝরণার জল যাহাতে পথশ্রান্ত যাত্রীরা অনায়াসে পাইতে পারেন তজ্জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। জল সুমিষ্ট।

কিছুক্ষণ চলিবার পর একটি প্রস্তর নির্ম্মিত সেতু পার হইয়া একটি চটি পাইলাম। গত সন্ধ্যার পরিচিত সেই ভদ্রলোকের মাতাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে তাঁহার পুত্রের মঙ্গল সংবাদ দিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। তাহার পরই হিউলি নদীর লৌহ নির্ম্মিত ঝোলান (Suspension bridge) সেতু পার হইলাম। নদীর অপর পার্শ্বে পর্ব্বত গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৌটার ন্যায় ঘরগুলি বড় সুন্দর দেখাইতেছিল। নদীর গর্ভে স্থানে স্থানে আবাদ হইয়াছে। উপর হইতে বিস্তৃত সতরঞ্চির মত দেখাইতেছিল। ক্রমে ক্রমে মোহন ও ছোট বিজলী চটি অতিক্রম করিয়া বড় বিজলীতে উপনীত হইলাম। এই কয়েকটী চটিতেই সুন্দর সুন্দর ঘর ও ধর্ম্মশালা আছে। মোহন চটির ঠিক নিম্নে হিউলি নদী। এখানে সদানন্দ ব্রহ্মচারীর একটি ধর্ম্মশালা আছে, ও জলের পাইপ আছে। অধিকন্তু হিউলি নদীর জলও পানয়োগ্য। একটি চড়াইয়ের পর ছোট বিজলী, পরে বড় বিজলী। এখানে সরকারী বাঙ্গালা আছে। চটি

গুলির ব্যবধান দেড় মাইল হইতে তিন মাইল। বড় বিজলীতে বিশ্রাম করিতে সঙ্কল্প করিলাম। ফুলবাড়ী হইতে আট মাইল আসা হইয়াছে। একটি পরিষ্কার ঘর বাছিয়া লইয়া তাহাতেই আশ্রয় লওয়া গেল; ঘরগুলি সব নিকান। সম্মুখেই জলের পাইপ। জলের কোন কষ্ট নাই। ভায়া আমার চটিওয়ালার সন্ধানে যাইলেন, উত্তম চাউল, উত্তম ঘি পাওয়া গেল। চাউল ৷৶৹ আনা সের ঘি ২৷৹ টাকা সের আলু ।৹ সের দুধ ।৹ সের। পাইপের জলে উত্তম করিয়া স্নান করিলাম। জল বড়ই ঠাণ্ডা। স্নানান্তে দুই ভাইয়ে মধ্যাহ্ন আহারে বসিয়া পড়িলাম, বড়ই ক্ষুধা, এত ক্ষুধা বুঝি পূর্ব্বে কখনও অনুভব করি নাই। অন্ন একবার দুইবার তিনবার পাতে আসিয়া পড়িল, ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইয়া গেল। বুঝিবা মাতাঠাকুরাণী ও দিদির জন্য কিছুই থাকে না। তৃপ্তির সহিত আহার করিতেছি দেখিয়া মাতাঠাকুরাণীর বড়ই আনন্দ। চাউল সুগন্ধ, অন্নও সুন্দর হইয়াছে, অথচ আমাদের চটিওয়ালার মতে অন্নপাক ঠিক হয় নাই। সে অনবরত আমাদিগকে স্মরণ করাইতে লাগিল যে আমরা ভালরূপে রন্ধন করিতে পারি নাই। ভোজনান্তে শয়ন করিলাম। দিবসে নিদ্রা হয় না। শুইয়া কত কি চিন্তা করিতেছি। কোথায় ছিলাম কি করিতে ছিলাম, আর আজ কোথায়। ভাবিতেছি, এমন সময় দেখি কম্বলের পাজামা ও চাপকান পরিহিত দুইটী সুন্দর যুবক আমার শয্যার নিকট আসিয়া বসিলেন। যেন কতদিনের পরিচিত। সহাস্য বদনে আমাদের মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা কোথায় কোথায় যাইব জানিতে চাহিলেন। গন্তব্য স্থান জানিতে পারিয়া গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এই তীর্থদ্বয়ের পাণ্ডা। বুঝিলাম এখান হইতে ঐসকল তীর্থস্থানে যাইতে হইলে দেবপ্রয়াগ হইয়া যাইতে হয়।

রাস্তা তত ভাল নয়, মাতাঠাকুরাণী তত কষ্ট সহ্য করিতে পারিবেন না ভাবিয়া সে মতলব ত্যাগ করিলাম। সচরাচর লোকে দেরাহুন্ দিয়া গঙ্গোত্তরী যাইয়া থাকেন। যদি কখনও তাহা ভাগ্যে ঘটে ভাবিয়া তাহাদের নাম ধাম লিখিয়া লইলাম। কথোপকথন করিতে করিতে তিনটা বাজিয়া গেল। ঝাঁপানিওয়ালারা যাইবার জন্য প্রস্তুত। একটি কথা লিখিতে ভুলিয়াছি। চটিগুলির উভয় পার্শ্বে এক এক মাইল দূরে এক একটি লাল নিশানা দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি মেথর দিগের নিশানা। সরকার হইতে প্রত্যেক চটিতে মেথরের বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু চটি ও সেই নিশানগুলির মধ্যবর্ত্তী জমিতে মলত্যাগ নিষেধ। তবে মেথর দিগকে কিছু বকশিস দিলে তাহারা সুবিধামত স্থান দেখাইয়া দেয়। দুই একটি পয়সা পাইলেই তাহারা সন্তুষ্ট। শীতের আধিক্য বশতঃ তাহাদের পরিধান কম্বলের পাজামা ও চাপ্‌কান্। দেখিলে মেথর বলিয়া বোঝা যায় না। মেথর রমণীদিগেরও বেশের পরিপাট্য আছে। পরিধানে নানা রঙের ঘাঘরা ও কোর্ত্তা। ভোজনাবশিষ্ট পাইবার জন্য তাহারা বড়ই লালায়িত। কথাটী রন্ধনের সময় যাত্রীদিগের মনে রাখা উচিত।

ঝাঁপানিওয়ালা আসিয়া উপস্থিত। কালক্ষেপ না করিয়া বাহির হইলাম। রাস্তা পূর্ব্বেরই মত। দুই পার্শ্বে পর্ব্বতের শ্রেণী, মধ্যে নদী। হঠাৎ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। পথে একটি অশ্বারোহী বৃদ্ধের সহিত দেখা হইল। তিনি সপরিবারে ৺ কেদারনাথ দর্শনে বহির্গত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকেরা পদব্রজে যাইতেছেন স্বয়ং অশ্বারোহণে। বৃষ্টির ভয়ে ৩ মাইল দূরবর্ত্তী কুণ্ড চটিতে আশ্রয় হইলাম। তখন সাড়ে চারিটা। মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে অনেক যাত্রী সেখানে আসিয়া জুটিল। সেই বৃদ্ধের বিষয় ভাবিতে লাগিলাম। এই বৃষ্টিতে সেই বৃদ্ধ কিরূপে এই পার্ব্বত্য পথে অশ্বারোহণে আসিতেছেন। যাহা ভাবিলাম তাহাই ঘটিয়াছে, অশ্ব পিচ্ছিল পথে পা রাখিতে না পারিয়া আরোহী সহিত পড়িয়া গিয়াছে, বৃদ্ধ আঘাত পাইয়াছেন। কয়েকজন ধরাধরি করিয়া এই কুণ্ড চটিতে লইয়া আসিলেন। জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলাম আঘাত সামান্য মাত্র, দুই এক দিন বিশ্রাম করিলেই আরোগ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু তিনি ৺কেদারনাথ দর্শনে এত অধীর হইয়াছেন যে অনবরত বলিতেছেন তাঁহার কিছুই হয় নাই, অথচ দাঁড়াইতে পারিতেছেন না। দেখিতে দেখিতে বৃষ্টি থামিয়া গেল। আকাশ পরিষ্কার হইল, বৃদ্ধকে এই চটিতে অন্ততঃ একদিন বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিয়া আমরা বাহির হইলাম। তখন বেলা সাড়েপাঁচটা। খানিকটা সমতল রাস্তা দিয়া যাইবার পর উতরাই আরম্ভ হইল। নামিয়া আসিয়া একেবারে সুরধুনী তীরে পৌঁছিলাম।

বেলা সাড়েছয়টা। সন্ধ্যা আগত প্রায়, স্থানটির নাম বান্দর চটি (বন্দর ভেল)। হরিদ্বার হইতে ৩৫ মাইল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে ঘর। রাস্তার বাম পার্শ্বে অশ্বথ গাছের তলায় সুরধুনী তীরে একটি ঘর লইলাম। মায়ের মধুমাখা অভয় বাণী শুনিতে লাগিলাম। মা সম্মুখ হইতে আসিয়া পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। নদীর অপর পার্শ্বে একেবারে খাড়া পাহাড় আবার দক্ষিণ পার্শ্বেও খাড়া পাহাড়। আমরা সেই পর্ব্বত মাঝে সুরধুনী তীরে যেন কোন মুনির আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। স্থানটী নির্জ্জন, গঙ্গার কল কল শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শোনা যাইতেছে না। রাত্রি হইয়া পড়িল। অদ্য অষ্টমী। সেদিন সুনীল আকাশে যে একবার চন্দ্রদেবের মোহনমূর্ত্তি দেখিয়াছে সে তাহা

কখন ভুলিবে না। জলযোগের বন্দোবস্ত হইল। জলযোগ বলাতে কেহ যেন মনে না করেন যে সামান্ত মাত্র জলযোগ করিয়া আমরা ক্ষান্ত হইলাম। এই পার্ব্বত্য প্রদেশে ক্ষুধার উদ্রেক খুব বেশী হয়। ঝরণার জল ও পর্ব্বতের বাতাস এত স্বাস্থ্যকর এবং পরিপাক শক্তি এতই বাড়াইয়া দেয়, যে আকণ্ঠপূর্ণ আহার করিলেও জলবাতাসের গুণে অতি শীঘ্রই সব হজম হইয়া যায়। আবার যাহারা পদব্রজে যান তাহাদের পথশ্রম, হজমের শক্তিকে আরও বাড়াইয়া দেয়। ঝাঁপান কিম্বা দাণ্ডি করিয়া যাইলেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথেষ্ট পরিচালনা হইয়া থাকে তাহাতেও হজমের সহায়তা করে, আবার আহারের জন্য যে জিনিষগুলি পাওয়া যায় তাহার সবগুলিই খাঁটি। কোনটাতেই ভেজাল নাই। প্রাতে চলিবার পূর্ব্বে সকলেরই কিছু কিছু জলযোগ করিয়া বাহির হওয়া উচিত। খালি পেটে চলিলে আমাশয় হইবার আশঙ্কা থাকে। রাত্রিতে আকণ্ঠপূর্ণ খাইয়া শয়ন করিলেও প্রাতে শয্যাত্যাগের পরই যথেষ্ট ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া থাকে। ক্ষুধা লইয়া চলা উচিত নহে। কেহ কেহ দুধ পান করিয়া বহির্গত হন। দুধ প্রায় সকল চটিতেই পাওয়া যায়। যদি নিজের পক্ষে তৈয়ার করা সম্ভব না হয়, চটিওয়ালার সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলে সকাল বেলা গরম লুচি, পেঁড়া ইত্যাদি পাওয়া যায়। চলিতে চলিতে মধ্যে মধ্যে তৃষ্ণা পায়, কেবল জলপান করা উচিত নয়। সঙ্গে কিছু মিছরি রাখা বিধেয়, এক টুকরা মুখে ফেলিয়া দিয়া জলপান করা উচিত। অভ্যাশ বসতঃ প্রাতঃকালে কিছু না খাইয়াই বাহির হইতাম; কিন্তু পরে সে অভ্যাস রাখিতে পারি নাই। দুই একদিন সকলবেলা খাইতে হইয়াছিল। আহারের পর শয়ন করিলাম। সুরধুনী তাহার কল কল ধ্বনিতে কর্ণে অমৃত ধারা ঢালিতে লাগিলেন ও সুশীতল

সমীরণে দেহ প্রাণ সুশীতল হইতে লাগিল। আমরা সকলে ঘুমাইয়া পড়িলাম। এখানে চোর ডাকাতের কোন ভয় নাই। যেখানকার জিনিষ সেইখানেই পড়িয়া থাকিবে, কেহই ছুঁইবে না। তবে যাত্রিদের মধ্যে সভ্য সমতলবাসী যদি কেহ অনুগ্রহ করেন তাহা স্বতন্ত্র। অসভ্য পর্ব্বতবাসী কিন্তু চুরি কাহাকে বলে জানে না। সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ "Crime is practically non-existent"—District Gazetteer, Garhwal p. 105. "Theft is practically unknown" *Ibid* p. 69.

অদ্য ২৫ শে বৈশাখ। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া পাঁচটা পোনের মিনিটের সময় রওনা হইলাম। ভয়ানক চড়াই। পাহাড় কাটিয়া রাস্তা হইয়াছে। খাড়া পাহাড়ের ঠিক নিম্ন দিয়া গঙ্গা যাইতেছেন, পাহাড়ের গায়ে গাছের লেশমাত্র নাই; একবার পদস্খলন হইলেই সর্ব্বনাশ। মনে হয় হাড়গোড় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া একটি মাংসপিণ্ডে পরিণত হইব। এইরূপ প্রায় তিন মাইল পথ অতিক্রম করিয়া একটু খোলা জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এইখানে মহাদেব চটি। পাহাড় একটু সরিয়া গিয়া গঙ্গাতীরে একটু চটি নির্ম্মাণ করিবার জায়গা দিয়াছেন। গঙ্গা গর্ভে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড ইতস্ততঃ পড়িয়া রহিয়াছে। জল আসিয়া তাহাতে ধাক্কা লাগিতেছে। জলের সঙ্গে অগণিত কাঠের তক্তা ভাসিয়া আসিতে দেখিলাম। শুনিলাম আরও উপরে গাছ কাটিয়া তক্তা করিয়া নদীর স্রোতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। তক্তাগুলি ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া হরিদ্বারের আরও নিম্নে আসিলে তাহাদিগকে ডাঙ্গায় তোলা হয়। পাহাড়ের উপর হইতে সমতলে কাঠ আনিবার ইহাই সহজ উপায়।

এই স্থানে মহাদেবের মন্দির, ধর্ম্মশালা ও কয়েকখানা ঘর ও দোকান

পাট আছে। একটি ডাকের বাক্সও দেখা গেল। প্রায় অৰ্দ্ধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া পুনরায় অগ্রসর হইলাম। এক মাইল সাধারণ চড়াইয়ের পর একটী বাংলা। এতক্ষণে হরিদ্বার হইতে ৪০ মাইল আসা হইল। নিকটে আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলাম। পূর্ব্বের রাস্তা খারাপ হইয়া যাওয়ায় পর্ব্বত কাটিয়া একটী রাস্তা করা হইয়াছে। রাস্তাটি ঠিক খাড়া পাহাড়ের উপর। রাস্তাটীর উপরে পাহাড় ছাতার ন্যায় ঝুঁকিয়া রহিয়াছে। পাছে মাথা ঘুরিয়া কেহ পড়িয়া যায় এই জন্য রাস্তার ধারে পাথর দিয়া একটু আড়াল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখান দিয়া চলিতে বড়ই ভয় হয়, এদিক ওদিক চাহিলে শরীরের রক্ত শুকাইয়া যায়। নিম্নে বেগবতী নদী লাফাইতে লাফাইতে ছুটিতেছে, সম্মুখে উচ্চ পাহাড়, মাথার উপর পাহাড়, মনে হইতেছে যেন ঘাড়ে পড়িয়া যাইবে। মহাদেব চটি হইতে চারি মাইল দূরবর্ত্তী শ্যামল চটি পার হইয়া নয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে কাণ্ডি চটিতে উপনীত হইলাম। ইহা শ্যামল চটি হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। পথি মধ্যে পর্ব্বতখোদিত কুলঙ্গীতে বসিয়া ব্রাহ্মণ কুমারগণের সুমধুর তানলয়যুক্ত সংস্কৃত শ্লোকাবৃত্তি বড়ই শ্রুতিমধুর। কাণ্ডি চটিতে মধ্যাহ্ন ভোজনের ব্যবস্থা করা গেল। এই স্থানটির উপরে ও নীচে গ্রামগুলি বেশ সুন্দর। রাস্তার দুই পার্শ্বে আম্র বৃক্ষের সারি, মাঝে মাঝে বসিবার জন্য বেঞ্চ। এখানকার গোপাল জীউর মন্দির ও ধর্ম্মশালা উল্লেখ যোগ্য। নিকটেই ঝরণার জল নিরবচ্ছিন্নবেগে বহিয়া যাইতেছে। স্নান করা গেল। দলে দলে গাভীসকল পাহাড় হইতে নামিয়া ঝরণার দিকে আসিতে লাগিল, তখন রৌদ্রের তাপ অধিক হইয়াছে; তাহারা রৌদ্রের তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া বাসার দিকে চলিতেছে। রাস্তার ধারে ঝরণার জল পান করিয়া তৃষ্ণা দূর করিতে লাগিল। এক এক দলে

এইরূপ ৩০।৪০টী গাভী আছে। এক একটি বালকের ইঙ্গিতে তাহারা চলিতেছে ও ফিরিতেছে। বালকেরা সব হৃষ্টপুষ্ট গৌর বর্ণ। পরিধানে পায়জামা ও চাপকান্। আমাদের অন্ন প্রস্তুত হইল। ভোজন সমাপন করিয়া যথাপূর্ব্ব শয়ন করিলাম। কতকগুলি গাভী আসিয়া উপস্থিত। তাহাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ দিয়া অতিথি সৎকার করা হইল। প্রায় আড়াইটার সময় পুনরায় যাত্রা করিলাম। অল্পদূর যাইলে ভীষণ উতরাই আরম্ভ হইল। সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়া গড় গড় নামিতে লাগিলাম। প্রতি পদক্ষেপেই মনে হইতে লাগিল এইবার বুঝি মুখ থুবড়াইয়া পড়িলাম। খুব সতর্ক হইয়া নামিতে লাগিলাম শেষে একটি ভাঙ্গা পুলের নিকটে আসিয়া পেঁৗছান গেল। নদীটি নায়ার বা ব্যাসগঙ্গানদী। প্রচণ্ড স্রোতে প্রধান সেতুটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পারাপারের জন্য অপর একটি সামান্য সেতু প্রতিনিধিত্ব করিতেছে। অতিকষ্টে তাহা পার হইয়া নদীর অপর পারে পৌছিলাম। সঙ্গীরা তখন কেহই আসিয়া পৌছান নাই। সেখান হইতে অভ্রুচ্চ পর্ব্বত দেখিয়া মনে হইতে লাগিল তাঁহারা কিরূপে আসিবেন।

পর্ব্বতের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলাম। ক্রমে ক্রমে অতি উচ্চ পর্ব্বত গাত্রে ঝাঁপান গুলি নয়ন পথে পড়িতে লাগিল। ভায়া আমার ঝাঁপান হইতে নামিয়া গড় গড় আসিতেছেন। ভায়া ও ঝাঁপান গুলির অবস্থা দেখিয়া মনে অত্যন্ত ভয় হইতে লাগিল। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাদের পতনের আশঙ্কা হইতে লাগিল। যাহাহউক সকলে নিরাপদে ব্যাস নদীর তীরে আসিয়া পৌছিলেন এবং অতি সন্তর্পনে সেতু পার হইয়া অদূরে ব্যাস চটিতে উপনীত হইলেন তখন বেলা; সাড়ে চারিটা। ব্যাস ঘাট গঙ্গা ও ব্যাসগঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত সমুদ্র বক্ষ হইতে ১৪১৪

ফিট উচ্চ। হরিদ্বার হইতে ৪৯ মাইল। এখান হইতে দুইটি রাস্তা বাহির হইয়াছে, একটি ল্যান্সডাউন অভিমুখে গিয়াছে অন্যটী আদোয়ানির দিকে গিয়াছে। প্রবাদ বেদব্যাস এইস্থানে বসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম ব্যাসঘাট। বেদব্যাসের নামে একটি মন্দির আছে। নিকটে ডাকঘর ও একটি ধর্ম্মশালা আছে। গঙ্গার জল বেশ পরিষ্কার, ব্যবহারের যোগ্য। আকাশে মেঘ দেখা দিতেছে, আর অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে বিবেচনা করিয়া এখানে রাত্রিতে বিশ্রাম করিবার আয়োজন করা গেল। অনেকগুলি দোকান আছে। আহার্য্য সামগ্রী সবই পাওয়া যায়। থাকিবার সুন্দর সুন্দর ঘরও অনেকগুলি আছে, ভায়া একটি ঘর পছন্দ করিয়া লইলেন। এই প্রদেশে প্রায় কেহই একতালা ঘরে থাকিতে চায় না। আমরা দুই এক স্থান ব্যতীত প্রায় সর্ব্বত্রই দ্বিতল ঘরে বাসা লইয়াছিলাম।

ভায়া আহারের যোগাড়ে রহিলেন। আমি জানালাতে বসিয়া গঙ্গা দর্শন করিতে লাগিলাম। গঙ্গার অপর পারে পর্ব্বত। তাহার পশ্চাতে পর্ব্বত, আবার তাহার পশ্চাতে পর্ব্বত, ক্রমান্বয়ে চলিয়া গিয়াছে, যেন প্রত্যেক পর্ব্বতটী গঙ্গা দর্শনেচ্ছু হইয়া একটি আর একটির মাথার উপর দিয়া উঁকি মারিতেছে। একটু বাম দিকে গঙ্গা ও ব্যাস-গঙ্গার সঙ্গম স্থল। নদীপার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণী বরাবর চলিয়া গিয়া কোথায় মিশিয়াছে। যতদুর দেখা যায় পর্ব্বতশ্রেণী ব্যতীত আর কিছুই নয়নগোচর হয় না। এখানে গঙ্গা একটা বাঁক লইয়াছেন এই বাঁকের বাম দিক হইতে ব্যাসগঙ্গা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পর্ব্বত যেন নদী তীর হইতে একটু সরিয়া গিয়া নিম্নে সমতল ক্ষেত্রে ব্যাস চটি নির্ম্মিত হইবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। আমাদের চটির ঠিক পশ্চাতে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত

সামান্য একটু সমতল ক্ষেত্র আছে। তাহাতে গমের চাষ হইয়াছে। কি পরম রমণীয় শোভা, না দেখিলে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয় না।

অল্প অল্প মেঘ পর্ব্বতের ওপার হইতে উঁকি মারিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া সমস্ত আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে মুষল ধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। বৃষ্টির মধ্য দিয়া আর কিছুই দেখা যায় না। যেন সমস্ত কুজ্ঝটিকাতে আবৃত হইয়া গেল। প্রকৃতিদেবী আমার প্রতি যেন বিরক্ত হইয়া মেঘান্তরালে সরিয়া দাঁড়াইলেন। আমি হাঁ করিয়া প্রকৃতির এই খেলা দেখিতে লাগিলাম। উপরে মেঘের কড় কড় নিনাদ, নিচে নদীর কল কল ধ্বনি ও বৃষ্টির ঝম ঝম শব্দ, একত্রে মিশিয়া কি একটা অশ্রুত পূর্ব্ব সঙ্গীতে পরিণত হইল। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল, আকাশ পরিষ্কার হইল, মেঘ সরিয়া পড়িল, প্রকৃতিদেবী পুনরায় হাসিতে লাগিল। বাতায়নতল ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলাম। রাস্তায় কোথাও একবিন্দু জল দাঁড়াইয়া নাই, সমস্তই খটখটে। রাস্তায় খানিকটা বেড়াইতে লাগিলাম। ক্রমে নিশার ছায়া আসিয়া পড়িল। চন্দ্রদেব আকাশের এক কোণে দর্শন দিলেন। চন্দ্র কিরণে পর্ব্বত নদী প্লাবিত হইয়া গেল। নিকটে ব্যাসদেবের মন্দিরে পূজার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। হিমালয়ের এই নিভৃত কন্দরে কত সহস্র বৎসর ধরিয়া এই ঘণ্টা নিনাদিত হইতেছে তাহা কে বলিবে! কত শত শোক তাপ জড়িত হৃদয়ে এই ধ্বনি ক্ষণেকের জন্য শান্তি আনিয়াছে তাহার হিসাব কে দিবে! এই নির্জ্জন প্রদেশে এই শান্তি আলয়ে এই ঘণ্টাধ্বনি কি মধুর! কে যেন গতি ফিরাইয়া দিল। কে যেন মন্দির অভিমুখে পথ দেখাইয়া দিল। ধীরে ধীরে মন্দিরসম্মুখে আসিয়া পড়িলাম, দেখিলাম আমার অগ্রেই মা ও দিদি এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

মহর্ষির চরণে প্রণামকরিয়া তাঁহার পূজা: দেখিতে লাগিলাম। যে পুণ্যক্ষেত্রে মহর্ষি বেদব্যাস একদা একাগ্রচিত্তে শ্রীভগবানের আরাধনা করিয়া অখিল বেদঃশাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, আজ কোন্ পুণ্যফলে মাদৃশ অধম সেই পবিত্র আশ্রমের রজরাশি স্পর্শ করিয়া জন্ম সার্থক করিল বুঝিতে পারিলাম না। পূজা সমাপনান্তে মহর্ষিকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম, বাসায় আসিয়া ক্ষণেক বিশ্রামের পর তৃপ্তির সহিত ভোজন করিলাম। সমস্ত দ্রব্যই সুস্বাদু বলিয়া বোধ হইল। আহারান্তে শুইয়া নানারূপ কথোপকথন করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

অদ্য ২৬শে বৈশাখ। অতি প্রত্যুষে সকলে শয্যা ত্যাগ করিলাম। ভায়া অতি শীঘ্রই বিছানা বাঁধিয়া ফেলিলেন। এসব কাজে তিনি খুব দক্ষ তাঁহাকে কিছুই বলিতে হয় না, যেখানে যেটি আবশ্যক বলিবার পূর্ব্বেই তিনি সেটি করিয়া রাখেন। সাড়ে পাঁচটার সময় বাহির হইলাম। গঙ্গার ধার দিয়া সোজা পথে হরিদ্বার হইতে ৫২ মাইল দূরবর্ত্তী ছালৌড়ি চটি অতিক্রম করিয়া আরও দুই মাইল পরে উমরাসু চটিতে উপনীত হইলাম। উমরাসু চটিটি বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ঘর আছে। একটি গায়ক ও গায়িকা নাচিতে নাচিতে সুললিত কণ্ঠে ভগবানের স্তুতি গান করিতেছিল আর একটি গায়িকা তাহাদের সহিত যোগদান করিলেন। প্রাতঃসমীরণে সেই পবিত্র সঙ্গীত কর্ণে অমৃত ধারা ঢালিয়া দিতে লাগিল। গান শুনিবার জন্য তথায় ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইলাম। পথে সৌর চটি অতিক্রম করিলাম। এই চটির নিকটে অনেকগুলি আম্র বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া গেল। রাস্তার দুই ধারে আম্র বৃক্ষের সারি। বেলা নয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় দেবপ্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

দেবপ্রয়াগ হরিদ্বার হইতে ৫৮ মাইল। দূর হইতে দেবপ্রয়াগের দৃশ্য বড়ই মনোহর, ধাপে ধাপে পর্ব্বতের গায়ে যেন কতক-গুলি লাল রঙের কৌটা সাজান রহিয়াছে। দেবপ্রয়াগ টিহরীর অন্তর্গত একটি সহর, অলকনন্দা ও ভাগিরথীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। সমুদ্র বক্ষ হইতে ১৫৫০ ফিট উচ্চ। এখানে অলকনন্দা প্রায় ১৪২ ফিট চওড়া, ভাগিরথী প্রায় ১১২ ফিট চওড়া, সঙ্গমের পর গঙ্গা প্রায় ২৪০ ফিট চওড়া। ভাগিরথী উচ্চ পাহাড়ের মধ্য হইতে প্রচণ্ড বেগে ভীষণ গর্জ্জন করিতে করিতে বক্ষ ফেনপুঞ্জে আবৃত করিয়া অলকনন্দার সহিত মিশিতেছেন। যাত্রীদিগকে বৃটিশ গাড়োয়ালস্থিত "বা" নগরী হইতে অলকনন্দার উপরিস্থিত ২৮০ ফিট দীর্ঘ একটি লৌহের ঝুলান সেতু পার হইয়া পরে দেবপ্রয়াগ যাইতে হয়। এখানে পূর্ব্বে একটি দড়ীর পুল ছিল, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে উহা লৌহ নির্ম্মিত হয়, পরে গোহনা বন্যায় তাহা অব্যবহার্য্য হইয়া যাইলে গত ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে নৈনিতালনিবাসী জনৈক মহাত্মা ৫০০০ টাকা ব্যয়ে পুনরায় নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই পুলের উপর হইতে নদীর ভীষণ জলপ্রবাহ ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়। এখানে কুমারী নিবেদিতার মন্তব্যটুকু পাঠকগণকে উপহার দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না

I have missed many chances of seeing Niagra, but I cannot imagine that it is any grander than the sight of the gorge as one stands on the bridge of Deva-prayag. Nor can I conceive of anything more terrible than the swirl and roar of the rivers here, where the steps lead down over the living rock to the meeting of the Alakananda and Bhagirathi. Wind and whirlpool

and torrent overwhelmed us with their fierceness of voice and movement. The waters roar and a perpetual tempest wails and rages. And as long as a thing is too much for one's mind to grasp, does it matter whether it is once or fifty times too much? Infinite is the terror of the waters at Devaprayag. Victory to the Infinite! Glory to the terrible!

অলকনন্দা গাড়োয়াল জেলার একটি প্রধান নদী। বদরিনাথের কিছু উত্তরে উঠিয়াছেন। মানা গ্রামের কিছু নিম্নে সরস্বতী ইহাতে আসিয়া মিশিয়াছেন। ধনাধিপতি কুবেরের রাজধানী অলকাপুরীর নিকট আসিয়া মর্ত্তভূমির দিকে ধাবিত হইয়াছেন বলিয়া তাহার নাম অলকনন্দা। বিষ্ণুপ্রয়াগে ধবলি গঙ্গা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। বদরিনাথ হইতে বিষ্ণুপ্রয়াগ ১৬ মাইল, অলকনন্দা ৫০০০ ফিট নামিয়া আসিয়াছেন। সঙ্গমস্থলে ধবলি গঙ্গা ৩৫ হইতে ৪০ গজ প্রশস্ত, অলকনন্দা ২৫ হইতে ৩০ গজ। উভয়েরই স্রোত প্রচণ্ড। সঙ্গমস্থল সমুদ্র বক্ষ হইতে ৪৭৪৩ ফিট উচ্চ। ক্রমে রুদ্র, গরুড়, পাতাল, ও বিরহী গঙ্গাকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণ পশ্চিম মুখে চামোলি পর্য্যন্ত আসিয়াছেন। পরে দক্ষিণাভিমুখে আসিয়া নন্দপ্রয়াগে নন্দাকিনীকে সঙ্গে লইয়াছেন। নন্দাকিনী ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থল সমুদ্রবক্ষ হইতে ২৮৬৪ ফিট উচ্চ। এখান হইতে দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখী হইয়া কর্ণ প্রয়াগে উপনীত হইয়াছেন। কর্ণ প্রয়াগে পিণ্ডার বা কর্ণ নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সঙ্গমস্থল সমুদ্র বক্ষ হইতে ২৩০০ ফিট উচ্চ। তথা হইতে ঠিক পশ্চিম ১৯ মাইল দূরে রুদ্র প্রয়াগ। রুদ্রপ্রয়াগ মন্দাকিনী ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থল, সমুদ্র বক্ষ হইতে ১৯১২ ফিট উচ্চ। তাহার পর ৪৪ মাইল দূরে দেবপ্রয়াগ।

দেবপ্রয়াগ সহরটী নদীবক্ষ হইতে পর্ব্বত গাত্রে ১০০ ফিট উচ্চে নির্ম্মিত। নগরের পশ্চাতে পাহাড়টী প্রায় ৮০০ ফিট উঠিয়াছে। সহরের মধ্যে রামচন্দ্রের একটি প্রকাণ্ড মন্দির আছে। মন্দিরটি বোধ হয় পাথর সাজাইয়া নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, কোনরূপ মসলা দেওয়া হয় নাই। একটি চত্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভাগিরথী ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থল হইতে যাইতে হইলে প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান অবলম্বন করিয়া যাইতে হয়, তাহা অতীব আয়াস সাধ্য। পাণ্ডারা বলেন মন্দিরে অনেক ধন দৌলত আছে। টিহরি রাজগণ মৃত্যুকালে তাঁহাদের নিজ ব্যবহারের অলঙ্কার ও পরিচ্ছদাদি এই মন্দিরে অর্পণ করিয়া থাকেন। মন্দিরের মস্তকে একটি শুভ্র গম্বুজ, একটি স্বর্ণময় গোলক ও চূড়া শোভা পাইতেছে। ব্রাহ্মণেরা ইহার বয়স ১০০০০ বৎসর অনুমান করেন। এখানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির আছে। মন্দির-গুলিতে গণেশ দুর্গা ও শিবলিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। অলকনন্দা গর্ভে বশিষ্ট কুণ্ডে ও ভাগিরথী গর্ভে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করিতে হয়। সঙ্গমস্থলে একটি মজবুত ঘাট আছে তথায় যাত্রীগণ লোহার শিকল ধরিয়া স্নান করিয়া থাকেন। জলের বেগে ভাসিয়া যাইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। এখানে মস্তক মুণ্ডন, পিতৃগণের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান, ভোজ্যদান, করা বিধেয়। অধিকন্তু যাত্রীরা গোদান করিয়া অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকেন।

দেবপ্রয়াগে বদরীনাথের পাণ্ডারা বাস করেন। যাত্রীদিগকে সঙ্গমস্থলে স্নান করাইয়া রামচন্দ্র ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্ত্তি দর্শন করাইয়া তাহাদিগের নিজ নিজ খাতায় নাম ধাম লিখিয়া লন। ৺ বদরীনাথে তাঁহারা আর খাতা রাখেন না। যাত্রীদের থাকিবার জন্য অনেকগুলি বাসাঘর আছে। কিন্তু পাণ্ডারা প্রায় নিজ বাটীতেই আশ্রয় দিয়া থাকেন। পাণ্ডারা অধিকাংশই সজ্জন, যাত্রীদিগকে অত্যন্ত যত্ন করিয়া

থাকেন। এরূপ দুর্গম অজানিত প্রদেশে তাহারা না থাকিলে যাত্রীদের কষ্টের সীমা থাকিত না।

দোকান আছে, দরকারী প্রায় সকল রকম জিনিষ পত্রই এখানে পাওয়া যায়। ছাতা জুতা প্রভৃতিও বিক্রয় হইতেছে। ভাল ভাল মিষ্টান্নেরও কয়েকখানা দোকান রহিয়াছে।

দেবপ্রয়াগ টিহরি রাজ্যের একটি সবডিবিসন। এখানে টিহরি রাজ্যের একজন ম্যাজিষ্ট্রেট থাকেন। অলকনন্দার অপর পারে 'বা'। ইহা ব্রিটিশ গাড়োয়ালের অধীন। এই স্থানে টেলিগ্রাফ আফিস ও পোষ্ট আফিস আছে। 'বা' সহরের ভিতর দিয়া অলকনন্দার ধারে ধারে যাত্রীপথ চলিয়া গিয়াছে। অপর একটি রাস্তা দেবপ্রয়াগ হইতে জঙ্গলের মধ্য দিয়া টিহরির দিকে গিয়াছে। এই রাস্তা দিয়া গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরী যাওয়া যায়।

অলকনন্দার সেতু পার হইয়া শঙ্কর আমাদিগকে পাণ্ডা ঠাকুরের বাটী লইয়া গেলেন। বাটীটি দ্বিতল। রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে ঠিক পর্ব্বত গাত্রে নির্ম্মিত। রাস্তা হইতে সোপান। পাণ্ডা ঠাকুর স্ত্রীর উপর অতিথি সৎকারের ভার দিয়া ৺ বদরীনাথ ধাম চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী আমাদিগকে সমাদর করিয়া থাকিবার জন্য দ্বিতলে একটি সুন্দর ঘর দেখাইয়া দিলেন। ঘরের পশ্চাৎ দিকের জানালা খুলিলেই দুই হাত দূরে গগণস্পর্শী পাহাড়। নগরাজ যেন বাটীখানিকে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছেন।

আমরা আমাদের গাঁটরিগুলি রাখিয়া শঙ্করের সহিত ভাগিরথী ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থলে চলিলাম। সঙ্গে পাণ্ডা ঠাকুরের ভাগিনেয় চলিলেন। তাঁহার উপদেশানুসারে কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি সম্পন্ন করা হইল।

নদীর জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা; অবগাহন স্নান করিতে সাহস হইল না। দুই তিনটি ধাপ নামিয়া বসিয়া পড়িলাম। এবং সেইখানে বসিয়া বসিয়া গাত্র মস্তকাদি ধৌত করিয়া লইলাম। মা ও দিদি আরও কতকটা নামিয়া স্বচ্ছন্দে প্রীতির সহিত অবগাহন করিয়া স্নান করিলেন। পুরোহিত মহাশয় মন্ত্র পড়াইতে লাগিলেন। স্নানান্তে রামচন্দ্রের মন্দির ও অন্যান্য কয়েকটি দেবমন্দিরাদি দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলাম। আমাদিগকে প্রসাদ দিবার জন্য পাণ্ডাপত্নীর বড়ই আগ্রহ। কিন্তু তাঁহার ক্রোড়ে দুই মাসের এক নবকুমার, সুতরাং প্রসাদের লোভ সম্বরণ করিয়া তাঁহাকে আমাদের জন্য রন্ধন করিবার প্রয়াস হইতে বহুকষ্টে নিবৃত্ত করিলাম।

আজকাল প্রত্যহ বৈকালে বৃষ্টি হইতেছে ভাবিয়া আমরা শীঘ্র শীঘ্র বাহির হইয়া পড়িব মনে করিলাম। তাড়াতাড়ি আহার করিয়া দেবপ্রয়াগ ত্যাগ করিলাম। সেতুর উপর হইতে অলকনন্দা ও গঙ্গার সঙ্গমের মহান দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়রসে আপ্লুত হইয়া পড়িলাম। শ্রীভগবান ভক্ত অর্জ্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন এ বুঝি তাহারই প্রতিচ্ছবি—এ বুঝি সেই বিরাট পুরুষেরই তাণ্ডব লীলা। একদিক হইতে গঙ্গার শুভ্রধারা, অপর দিক হইতে অলকনন্দার নীল জলরাশি স্বর্গের কোন্ নিভৃত প্রদেশ হইতে যেন আর্য্যাবর্ত্তের মঙ্গল সাধনের মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া আসিতেছিল। এই মহা পুণ্যক্ষেত্রে পরস্পরে মিলিয়া একপ্রাণ একদেহ হইয়া আবার সেই পূর্ব্বের মত প্রচণ্ডবেগে দৌড়াইয়াছে। অভ্রংলিহ গিরিশ্রেণীর মধ্য দিয়া এই দুইটি স্রোতস্বিনী যেখানে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়াছে, সেখানকার সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিলে সেই উদ্বেলিত বিক্ষিপ্ত জলরাশির তরঙ্গভঙ্গিমা, অনন্ত বিকীর্ণ বারিকণার অনুপম সৌন্দর্য্য-রাশি প্রত্যক্ষ করিলে এবং ভীম ভৈরব তরঙ্গাভিঘাতধ্বনি কন্দরে কন্দরে

প্রতিধ্বনিত হইতে শুনিলে অতিবড় নাস্তিকেরও মস্তক ভগবানের চরণে লুটাইয়া পড়ে, ভক্তিগদ্‌গদচিত্তে বলিয়া উঠে—

আখ্যাহিমে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর ! প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম॥

(৪)

শ্রীনগর।

দেবপ্রয়াগ হইতে রাণীবাগ—৭॥ মাইল।
" " রামপুর—১১ মাইল।
" " ভিল্ল কেদার—১৫ মাইল।
" " শ্রীনগর—১৮ মাইল।

অলকনন্দা পার হইয়া "বা" নগরীতে পৌছিলাম। বামতীর হইতে দেবপ্রয়াগের অপূর্ব্ব শোভা আর একবার দেখিয়া লইলাম। এ সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার আর কোন অবসর পাইব কি না জানি না। যতই দেখি পরিতৃপ্তি হয় না।

ভাগিরথীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া আমরা অলকনন্দার বামতীর ধরিয়া যাইতে লাগিলাম। রাস্তা একই রকমের। উভয় পার্শ্বে আকাশ ভেদী পর্ব্বতশ্রেণী, মধ্যে অলকনন্দা। ক্রমে সন্ধ্যার ছায়া আসিয়া পড়িল। সূর্য্যদেব পর্ব্বতের ওদিকে নামিয়া পড়িলেন। আমরাও সম্মুখবর্ত্তী রাণীবাগ চটীতে আশ্রয় লইলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। চন্দ্রদেব বেগতিক দেখিয়া সরিয়া পড়িলেন। সুযোগ পাইয়া অন্ধকার চারিদিক দখল করিয়া বসিলেন। ধরিত্রীর এ এক ভীষণ মূর্ত্তি। তাড়া-তাড়ি আহার করিয়া শয়ন করিলাম। শুইয়া মেঘের গর্জ্জন ও বৃষ্টি পতনের শব্দ শুনিতে লাগিলাম।

অদ্য ২৭শে বৈশাখ শনিবার। প্রত্যুষে উঠিয়া মুখ ধুইবার জন্য পাইপের নিকট যাইলাম। সর্ব্বনাশ! পাইপে জল পড়িতেছে না, বোধ হয় বৃষ্টি ও ঝড়ের বেগে পাথর গড়াইয়া আসিয়া উপরের পাইপের মুখ বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে। কোথায় জল পাইব ভাবিতেছি এমন সময়ে শঙ্কর হাসিতে হাসিতে জল লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাদের উঠিবার আগে তিনি এই ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া তলদেশবাহিনী নদী হইতে জল আনিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট হইতে জল লইয়া মুখ হাত প্রক্ষালণ করিয়া লইলাম। ৫টা ৪৫ মিনিটের সময় রাণীবাগ ত্যাগ করিলাম। দেড় মাইলের পর একটি বাংলা দেখা গেল। ক্রমে রামপুরে আসিয়া পৌছিলাম। রামপুরের সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য স্রোত বহিয়া গিয়াছে। আমরা সেই স্রোত বামে রাখিয়া কতকটা অগ্রসর হইয়া একটি পাকা সেতু দ্বারা তাহা পার হইলাম। পার্ব্বত্য রমণীগণ লৌহ নির্ম্মিত কলসে নদীগর্ভ হইতে জল লইয়া আসিতেছে দেখিয়া বোধ হইল যেন দেবকন্যাগণ পর্ব্বত গাত্রে খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন। ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া পুনরায় চলিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে একটি বিস্তৃত উপত্যকায় আসিয়া পৌছিলাম। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতের প্রাচীর। মধ্যে একমাইল ব্যাসের একটি গোলাকার সমতলক্ষেত্রে চাষবাস হইতেছে। রাস্তাটি আমাদের বাঙ্গালাদেশের গ্রাম্য রাস্তার ন্যায়, পথের ধারে কাঁটার বেড়া। বেড়ার মধ্যে গম তামাক ইত্যাদির চাষ হইয়াছে। ৩ মাইল পরে জলাশু গ্রাম। এখানে নদীগর্ভে খানিকটা সমতল জমি পাওয়ায় আবাদ হইয়াছে। নদীর স্রোতের পার্শ্বে খানিকটা সমতলভুমি, তাহার পার্শ্বে পাহাড়। রাস্তা পাহাড়ের গা দিয়া চলিয়া গিয়াছে। রাস্তা হইতে শস্য ক্ষেত্রগুলি সতরঞ্চির মত দেখাইতে লাগিল। দেখিতে বড়ই সুন্দর।

ক্রমে ক্রমে বিল্বকেদার বা ভিল্লকেদারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ঢুংচম বা খাণ্ডব নদী এখানে আসিয়া অলকনন্দার সহিত মিশিয়াছেন একটি লৌহ সেতু দিয়া তাহা পার হইতে হয়। সঙ্গমস্থলের উপরে একটি উচ্চ পাহাড়ে ভিল্লকেদারের মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

নিকটেই অনেকগুলি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডারা তাহা নারায়ণ ও কালীমূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তন্মধ্যে একটি মূর্ত্তি বুদ্ধ মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইল। দ্রষ্টব্য বিষয় গুলির মধ্যে বহুপুরাতন একটি শিবলিঙ্গ, মেঝের উপর খোদিত চরণ চিহ্ন ও পদ্ম উল্লেখ যোগ্য। গত গহনা বন্যায় স্থানটির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। এই স্থানের অপর একটি নাম ঢুণ্ড প্রয়াগ। এই স্থানে অর্জ্জুন মহাদেবকে তপস্যায় সন্তুষ্ট করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। সে উপাখ্যান অনেকেই মহাভারতে পড়িয়াছেন। যাঁহারা পড়েন নাই তাঁহারা বনপর্ব্বের কৈরাত পর্ব্বাধ্যায় পড়িয়া দেখিতে পারেন।

যখন পাণ্ডবগণ কাম্যবনে বাস করিতেছিলেন সেই সময়ে দেবগণের নিকট হইতে দিব্যাস্ত্র সকল লাভ করিবার জন্য অর্জ্জুন সশস্ত্র হিমালয় প্রদেশে গমন করিলেন, এবং তথায় একটি অতি রমণীয় স্থান নির্ব্বাচন করিয়া উগ্রতপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুকাল পরে পশুপতি কিরাত বেশে এবং ভগবতী ও অন্য কতিপয় রমণী কিরাত রমণীর বেশে যেখানে অর্জ্জুন তপস্যা করিতেছিলেন তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠিক সেই সময়ে মূক নামক এক দানব বরাহরূপ ধরিয়া অর্জ্জুনকে আক্রমণ করিল। অর্জ্জুন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বাণক্ষেপ করিলেন, কিরাতও বরাহকে লক্ষ্য করিয়া বাণক্ষেপ করিলেন। দুইটী তীরই এককালে বরাহরূপী দানবকে বিদ্ধ করিল। দানব প্রাণত্যাগ করিল।

তখন কিরাত ও অর্জ্জুনের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। অর্জ্জুন কহিলেন আমি অগ্রে বাণ ত্যাগ করিয়াছি তুমি কেন তাহার প্রতি বাণ ত্যাগ করিলে? এরূপ আচরণ মৃগয়াধর্ম্ম বিরুদ্ধ। কিরাত কহিলেন আমি প্রথমেই বরাহের প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলাম এবং আমারই শরে সে নিহত হইয়াছে। তুমি আমার লক্ষ্যের প্রতি শরক্ষেপ করিয়া গর্হিত কার্য্য করিয়াছ। তোমাকে তজ্জন্য শাস্তি দিব।

বিবাদ ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উঠিল। উভয়ের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। শরজালে আহত হইয়াও কিরাত বিশেষ বিচলিত হইল না। অর্জ্জুনের অস্ত্রশস্ত্র ফুরাইয়া গেল, তখন উভয়ে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কিরাত কর্ত্তৃক ভূতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া অর্জ্জুন কিছুক্ষণ হতচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিয়া সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং মৃণ্ময় শিবমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া মহাদেবের অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মৃণ্ময় মূর্ত্তির মস্তকে মাল্য দিয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন সেই মাল্য কিরাতের শিরোদেশে দুলিতেছে।

অর্জ্জুন তখন বুঝিলেন পশুপতিই কিরাতবেশে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছেন। ভক্তির উচ্ছাসে বিহ্বল হইয়া গেলেন—কিরাতের পদপ্রান্তে লুঠাইয়া পড়িলেন। না জানিয়া যে অপরাধ করিয়াছেন, তাহার জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

পশুপতি ক্ষমা করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং প্রসন্নচিত্তে সমন্ত্রক পাশুপত অস্ত্র দান করিলেন। দেবাদিদেব এইখানে কিরাতবেশ ধারণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানের নাম ভিল্লকেদার হইয়াছে ইহাই প্রবাদ।

ওপারে মার্কণ্ডেয় গঙ্গা নামে একটি জলস্রোত অলকনন্দায় আসিয়া পড়িয়াছে। প্রবাদ সঙ্গমস্থলে মার্কণ্ডেয় ঋষি তপস্যা করিয়াছিলেন। সোমবারে অমাবস্যা পড়িলে এখানে খুব ধুম ধাম হয়। ভিল্লকেদারে কিছুক্ষণের জন্ত বিশ্রাম করিলাম। বিশ্রামান্তে কতকগুলি দ্রষ্টব্য বিষয় দেখিয়া রওনা হইলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অপর একটি রাস্তার সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে টিহরি হইতে একটি রাস্তা আসিয়া আমাদিগের রাস্তায় মিশিয়াছে। রাস্তাটি অলকনন্দার উপর দিয়া আসিয়াছে। একটি ঝোলা সেতু দ্বারা অলকনন্দা পার হইতে হয়। ওপারে পাহাড়ের গায়ে রাস্তাটি দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যেন কে একটি মালা পাহাড়ের গায়ে রাখিয়া দিয়াছে। রাস্তাটি বাম দিকে রাখিয়া আমরা যাইতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে শ্রীযন্ত্রঃঘাটে আসিয়া পৌছিলাম। ইহা হরিদ্বার হইতে ৭৫ মাইল।

এখানে অলকনন্দা একটু প্রশস্ত। নদীর বামপার্শ্বে প্রায় অর্দ্ধ মাইল একটি চড়া। রাশীকৃত বালুকা। নদীগর্ভে স্থানে স্থানে স্রোতবিক্ষিপ্ত ছোট বড় নানা রকমের প্রস্তরখণ্ড। তাহাদের মাঝে মাঝে অনেকগুলি তক্তা আসিয়া লাগিয়া রহিয়াছে। নদীতে জল কম থাকায় তক্তাগুলি পাথরে লাগিয়া আটকাইয়া আছে, ভাসিয়া যাইতে পারে নাই। ঘাটের নিকটেই রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি প্রকাণ্ড অশ্বথ বৃক্ষ। তলাটি পাথর দিয়া বাঁধান। তাহার উপর বসিয়া অনেকগুলি লোক বিশ্রাম করিতে পারেন। আমরা আসিবার পূর্ব্বে সেই বাঁধান চত্বরের উপরে কয়েকজন লোক বসিয়াছিল। ঘাটটিও লোকে পরিপূর্ণ। ইহাদের অধিকাংশই স্থানীয় লোক। এত জনতার কারণ জানিবার জন্ত বড়ই কৌতূহল হইল। অনুসন্ধানে জানিলাম যে একটি যাত্রী এই স্থানে ভগবৎক্রোড়ে

স্থান পাইয়াছেন। এই দেশের রীতি অনুসারে তাহার দেহ নদীজলে ভাসাইয়া দেওয়া হইতেছে। যাত্রীটি একাকী যাইতেছিলেন, তাহার বাড়ি কোথায় কেহই জানে না। তাহার আত্মীয় স্বজন কেহই সংবাদ পাইবেন না। তাহারা কতদিন উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিবেন। সোৎসুক নয়নে পথপানে চাহিয়া থাকিবেন। কত আশায় বুক বাঁধিয়া দিনের পর দিন গণনা করিবেন। মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, চলিয়া যাইবে পরে হতাশ প্রাণে তাহার প্রত্যাগমনের সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া তাহার কথা ভুলিবার চেষ্টা করিবেন। একপ্রাণে একমনে ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া এই ভাগ্যবান ভগবদ্দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। ভগবান তাহাকে ক্রোড়ে আশ্রয় দান করিয়াছেন। সুতরাং তাহার জন্য আমাদের মন ততটা বিচলিত হইল না, কিন্তু তাহার আত্মীয় পরিজনের কথা ভাবিতেও আমাদের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল।

এই ঘটনার কথা ভাবিতে ভাবিতে আমরা এক মাইল পথ অতিক্রম করিয়া শ্রীনগর সহরে উপনীত হইলাম।

শ্রীনগরসহরটী নূতন, গাড়োয়াল জেলার বর্ত্তমান হেড কোয়ার্টার পৌড়ি হইতে ৮ মাইল দূরে সমুদ্র বক্ষ হইতে ১৭০৬ ফিট উচ্চে অলক-নন্দার বাম উপকূলে অবস্থিত। পুরাতন শ্রীনগর গাড়োয়াল রাজ্যের রাজধানী ছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ বন্যায় তাহা একেবারে ভাসিয়া গিয়াছে। রাজভবনের কোন চিহ্ন নাই। যেখানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল সেখানে এখন কৃষিক্ষেত্র হইয়াছে। তথা হইতে ৫ ফারলঙ উত্তর পূর্ব্বে পাহাড়ের উপর একটি উচ্চ স্থানে এই নূতন সহর নির্ম্মিত হইয়াছে। রাস্তাগুলি পরিষ্কার, দুইপার্শ্বে গাছের সারি। রাস্তার পার্শ্বের বাটীগুলি দ্বিতল। নিম্নতলে দোকান, সেই সকল দোকানে নানা প্রকার দ্রব্য

বিক্রিত হইতেছে। জুতা, ছাতা, কম্বল, অইল ক্লথ (oil cloth) প্রভৃতি অনেক দ্রব্য এখানে পাওয়া যায়। বাটীগুলি প্রস্তর নির্ম্মিত, ছাদ শ্লেটের। এখনকার সহরের ন্যায় এখানে হাঁসপাতাল, পুলিষ, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ আফিস, উচ্চশ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয় ধর্ম্মশালা ও একটি ডাক বাংলা আছে। সহরে প্রবেশ করিলেই হাঁসপাতাল। হাঁসপাতালটি সদা ব্রত ফণ্ড হইতে ১৫০০০ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত। প্রাচীনকালে গাড়োয়াল রাজ কতকগুলি গ্রামের রাজস্ব সাধারণের উপকারের জন্য দান করেন। ঐ টাকা কতক দেবতার সেবায় ও মন্দিরাদির সংস্কারে এবং কতক দরিদ্র যাত্রীদের সেবায় ব্যয়িত হয়। যে টাকা দরিদ্র যাত্রীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাতে একটি ফণ্ড বা ভাণ্ডার হইয়াছে তাহাই সদাব্রত ফণ্ড।

বর্ত্তমান সহরের অর্দ্ধমাইল নিম্নে শ্রীশ্রী৺কমলেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দিরটি একটি বৃহৎ প্রাঙ্গনের মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরের সম্মুখে একটি বৃহৎ পিত্তলের নির্ম্মিত বণ্ড। প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে অট্টালিকা। একটি দ্বিতল কামরায় পাণ্ডারা শঙ্করাচার্য্যের বেদি দেখাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন এখানে শঙ্করাচার্য্যের একটি মঠ ছিল।

এ দেশীয় বন্ধ্যারমণীরা সন্তান কামনা করিয়া বৈকুণ্ঠ চতুর্দ্দশীর রাত্রিতে ঘৃতের প্রদীপ লইয়া এই কমলেশ্বর দেবের মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস যিনি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিতে পারেন ও যাহার প্রদীপ সমস্ত রাত্রি প্রজ্জ্বলিত থাকে, তাঁহারই কামনা সিদ্ধ হয়।

ইহা ব্যতীত এখানে পঞ্চ পাণ্ডবের মন্দির আছে। তথায় নারদেরও একটি মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিঞ্চিৎ দূরে অন্য দিকে লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির। যদি কেহ বদরি নারায়ণ পর্য্যন্ত যাইতে না পারেন এই

স্থানে লক্ষ্মী নারায়ণকে দর্শন ও তাঁহাদের পূজা করিলে বদরীনারায়ণ দর্শন ও তাঁহার পূজার ফললাভ হয়, পাণ্ডারা এইরূপ বুঝাইয়া থাকেন। লক্ষ্মী নারায়ণের দুইটি মন্দির আছে একটি পুরাতন, ভীষণ জঙ্গল মধ্যে, যাওয়া নিতান্ত দুরূহ। দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত নূতন। মন্দিরের সম্মুখে গরুড় দেবের একটি মূর্ত্তি আছে। পাণ্ডারা বলেন এই মূর্ত্তিটি নূতন। পূর্ব্বে এখানে অপর একটি মূর্ত্তি ছিল—তাহা একদিন হঠাৎ আকাশে উড়িয়া গেলে এই মূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে নদীর অপর পারে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিকট কালিকাদেবীর যজ্ঞবেদী। পূর্ব্বে এখানে নরবলি হইত। জনপ্রবাদ, শঙ্করাচার্য্য পাথরটি নদীগর্ভে ফেলিয়া দিয়া নরহত্যা নিবারণ করিয়াছেন।

গাড়োয়াল একটি প্রাচীন রাজ্য। বিষ্ণুপুরাণ, মহাভারত, ও স্কন্দপুরাণে ইহা নাগ হুন কিরাতাদি দ্বারা অধ্যুসিত কেদারখণ্ড নামে অভিহিত। বর্ত্তমান রাজবংশ শালিবাহনের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন। নাগরাজগণের প্রাধান্ত পাণ্ডুকেশ্বরে নাগপূজায় কতকটা অনুমিত হয়। পৌড়ির নিকটে নাগদেব নামক স্থানে নাগ এখনও পূজা পাইয়া থাকেন। পূর্ব্বে গাড়োয়াল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। হুয়েনসাঙের বিবরণীতে ব্রহ্মপুরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। গোপেশ্বর মন্দিরে একটি প্রকাণ্ড ত্রিশূল একটি প্রাচীন রাজ্যের সাক্ষ্য দিতেছে। একটি রাজ্যের রাজধানী জ্যোতির্ধামে ছিল বলিয়া বোধ হয়। পাণ্ডুকেশ্বর ও নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে অনেকে অনুমান করেন যে এই রাজ্য তুষারধবল হিমাদ্রি শিখর হইতে হিমালয়ের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অজয় পাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিয়া প্রথমে একচ্ছত্র রাজা হন। পালবংশে

অনেকগুলি রাজা ক্রমান্বয়ে দেওলগড়ে রাজত্ব করেন। ১৪৮৩ অব্দে বাহাদুর সা লোদী গাড়োয়াল রাজ্য পরিদর্শন করিতে আসেন। গাড়োয়াল রাজের অতিথি-সৎকারে সন্তুষ্ট হইয়া যাইবার সময় তদানীন্তন রাজা বলভদ্র সাকে সা উপাধিতে ভূষিত করেন। টিহরি রাজগণ অদ্যাবধি এই উপাধি ধারণ করিতেছেন। বলভদ্র সার পর মান সা, শম সা, দুলারাম সার নাম পাওয়া যায়। শেষোক্ত রাজার রাজত্ব কালে নিকটবর্ত্তী কুমায়নরাজ রুদ্রচাঁদের সহিত সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। রুদ্রচাঁদের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র লক্ষ্মীচাঁদ সাত বার গাড়োয়াল রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু গাড়োয়ালরাজ মহীপতি সার নিকট পরাজিত হইয়া গাড়োয়ালজয়ের আশা পরিত্যাগ করেন। মহীপতি সা রাজধানী দেওলগড় হইতে শ্রীনগরে লইয়া আসেন। মোগলদের রাজত্বকালে গাড়োয়ালরাজ মোগল সরকারে কোন রাজস্ব দিতেন না। জনপ্রবাদ, মোগল সম্রাট আকবর রাজস্ব নির্দ্ধারণ করিবার জন্য রাজ্যের আয় ও একটি মানচিত্র চাহিয়া পাঠান। তদানীন্তন গাড়োয়ালরাজ সম্রাটসমীপে একটি শীর্ণ উষ্ট্র পাঠাইয়া দিয়া বলিয়া পাঠান ইহাই গাড়োয়াল রাজ্যের প্রতিকৃতি; সম্রাট সন্তুষ্ট হইয়া গাড়োয়ালরাজকে রাজস্ব হইতে অব্যাহতি দেন।

গাড়োয়ালরাজকে অনবরত কুমায়ুন ও নেপাল রাজার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতে হইত। অবশেষে ১৮০৩ অব্দে অমর সিংহ থাপা প্রমুখ সেনানীগণের নেতৃত্বে গুর্খা সৈন্য গাড়োয়াল আক্রমণ করেন। রাজা প্রধামন সা ভূমিকম্প প্রভৃতি কতিপয় অশুভ চিহ্ন দেখিয়া ও রাজপুরোহিতগণের ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। শত্রুসৈন্যকে বাধা দিবার কোন বন্দোবস্ত হইল না। তাহারা নির্ব্বিবাদে রাজধানী দখল করিল, রাজা সপরিবারে দেহরাদুনে পলাইয়া

আত্মরক্ষা করিলেন। তথা হইতেও তাড়িত হইয়া লাক্ষৌরার রাজার আনুকুল্যে ১২০০০ সৈন্য সমভিব্যাহারে দুন পুনরুদ্ধারের জন্য একবার চেষ্টা করেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে পুত্র সুদর্শন সা ইংরাজ রাজত্বে পলাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। অমরসিংহ শ্রীনগরে রাজধানী রাখিয়া গাড়োয়াল রাজ্য কঠোর ভাবে শাসন করিতে লাগিলেন। গুর্খাসৈন্য গাড়োয়াল রাজ্য অধিকার করিয়া ক্ষান্ত হইল না। ব্রিটিশ অধিকারে হস্তক্ষেপ করিল। লর্ড হেষ্টিংস গুর্খাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য আয়োজন করিতে বাধ্য হইলেন। গুর্খারা গাড়োয়াল রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইল। ১৮১৫ অব্দে নেপালযুদ্ধ শেষ হইলে সুদর্শন সা ইংরাজের নিকট হইতে বর্ত্তমান টিহরি রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন।

অলকনন্দা ও মন্দাকিনীর পূর্ব্ব দিকস্থিত জনপদ ইংরাজ অধিকারে রহিল, সুতরাং শ্রীনগর ইংরাজেরই হইল। গাড়োয়ালরাজ টিহরিতে রাজধানী স্থাপন করিলেন।

গত সিপাহি বিদ্রোহের সময় সুদর্শন সা ইংরাজদিগকে সমুচিত সাহায্য করেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে ইংরাজরাজ ভবানী সার উপর রাজ্যভার অর্পণ করেন। তিনি ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে এবং তাঁহার পুত্র প্রতাপ সা ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। পরবর্ত্তী রাজা সার কীর্ত্তি সা K. C. S. I, ১৮৯২ সালে রাজগদি প্রাপ্ত হন। বর্ত্তমান রাজা নরেন্দ্র সা বাহাদুর মেও কলেজে অধ্যয়ন সমাপন করিয়া গত ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ক্যাপ্টেন উপাধি লাভ করিয়াছেন।

আমরা ধর্ম্মশালায় আশ্রয় লইলাম। পাশাপাশি দুইটি বাড়ী। মধ্যে একটি দরজা। বাড়ী দুইটিরই মধ্যে প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে কামরা,

কামরাগুলি দ্বিতল। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে জলের পাইপ। পর্ব্বতের উপর হইতে ঝরণার জল আসিতেছে। পাইপ হইতে সর্ব্বদা জল পড়িতেছে।

ধর্ম্মশালাটি যাত্রীতে পরিপূর্ণ। বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, রাজপুত, পাঞ্জাবী মারহাটী, মাদ্রাজী সকল জাতির একত্র সমাবেশ। বাঙ্গালী যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী। অন্যান্য প্রদেশের যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই সংখ্যা প্রায় সমান, বরং পুরুষের সংখ্যাই কিছু বেশী বলিয়া বোধ হইল। এখানেই আমরা স্নান আহার সমাপন করিয়া লইলাম। সহরে প্রবেশ করিবার সময় যাহা কিছু দেখিবার সব দেখিয়া আসিয়াছি।

(৫)

রুদ্রপ্রয়াগ।

শ্রীনগর হইতে সুকরতা—৪ মাইল।	শ্রীনগর হইতে নরকোটা—১৪ মাইল।
,, ,, ভট্টিসেব—৭॥০ ,,	,, ,, গুলাব রায়—১৮ ,,
,, ,, খাঁকরা—১২ ,,	,, ,, রুদ্রপ্রয়াগ—২০ ,,

শ্রীনগর ছাড়িয়া পুনরায় পাহাড় ও নদীর মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। একদিকে আকাশস্পর্শী পর্ব্বতের শ্রেণী, অন্য দিকে পাতালবাহিনী নদীর স্রোত। সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে ঢলিয়া পড়িতেছেন। রৌদ্রের তাপ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। সেই অপ্রখর তাপে বেশ আরাম বোধ করিতে করিতে আমরা ধীরে ধীরে চার মাইল দূরবর্ত্তী সুকরতা চটি অতিক্রম করিলাম। চটটী যাত্রীতে পরিপূর্ণ। চটি ছাড়িয়া প্রায় এক মাইল আসিয়াছি এমন সময় হঠাৎ একখণ্ড মেঘ কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। এখন অনেকটা সতর্ক হইতে শিখিয়াছি। Water proof coat বরাবর সঙ্গে রাখিতেছি। মা ও দিদির ঝাঁপান oil clothএ ঢাকিয়া দেওয়া হইল। বৃষ্টিতে ভিজিবার ভয় রহিল না। রাস্তায় একটি বরযাত্রীদলের সহিত দেখা হইল। তাহারা বিবাহের পর কন্যা লইয়া ফিরিতেছিল। বর কন্যা খোলা দাণ্ডিতে—

বরযাত্রীরা পদব্রজে। বৃষ্টিতে সকলেই ভিজিয়া গিয়াছেন। বরকন্যার পরিহিত লাল রঙের বস্ত্র ভিজিয়া একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। বরের ছোট ভাই, শ্রীনগর ইংরাজি বিদ্যালয় হইতে মেট্রিকিউলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এলাহাবাদে কলেজে অধ্যয়ন করিতেছেন। তাঁহার সহিত কথোপকথনে আনন্দলাভ করিলাম। এই আধ ঘণ্টার আলাপে এতই ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িলাম যে, তিনি আমাদিগকে তাহার বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভায়ার অবকাশ অল্প। তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ আমাদের ভাগ্যে ঘটিল না। তিনি আমাদের সহিত অনেক দূর আসিলেন। অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া উচ্চ পর্ব্বতগাত্রে তাঁহাদের গ্রাম দেখাইলেন। ফলতঃ আমরা তাঁহার অনুগমন করিলাম না বলিয়া তিনি অবশেষে দুঃখিত অন্তঃকরণে আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। আমরাও অগ্রসর হইয়া ভট্টিসেরা চটিতে পৌছিলাম। ঘরগুলি সব যাত্রীতে পরিপূর্ণ। ভাল ভাল ঘরগুলি সব আগেই অধিকৃত হইয়া গিয়াছে। শেষ প্রান্তে একটি স্রোতের পার্শ্বে একটি ঘর আমাদের ভাগ্যে মিলিল। ঘরটি বড় নীচু। এইখানেই অদ্য আমাদিগকে রাত্রিযাপন করিতে হইবে। গাঁটরি নামাইয়া সতরঞ্চি বিছাইলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় একদল গায়ক ও গায়িকা আমাদের ঘরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা নিকটবর্ত্তী গ্রামে বিবাহের আসরে গান বাজনা করিয়া ফিরিতেছিল। পথে বৃষ্টিতে বড় কষ্ট পাইয়া ভিজিয়া গিয়াছে। কোথাও আশ্রয় না পাইয়া আমাদের বাসার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমাদের ঘরটি একটু বড়। এক অংশে তাহাদের স্থান করিয়া দেওয়া গেল। তাহারা যেন হাতে স্বর্গ পাইল। আহারাদি করিয়া

তাহারা নাচ গান আরম্ভ করিয়া দিল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া নৃত্যগীত চলিল। এ অঞ্চলের নাচ গান দেখিবার সাধ ছিল—তাহা ভগবানের ইচ্ছায় অদ্য মিটিল। গান বুঝিতে পারিলাম না অথচ বড়ই মধুর লাগিল। গান শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

২৮শে বৈশাখ রবিবার। প্রাতে ভট্টিসেরা ত্যাগ করিলাম। একটি চড়াই আরম্ভ হইল। ক্রমে হরিদ্বার হইতে ৮৬ মাইল অতিক্রম করিলাম। দূর হইতে পর্ব্বতশিখরে তুষাররাশি দেখা যাইতে লাগিল। দৃশ্য অতীব মনোহর। দুই মাইল উতরাইএর পর খাঁকড়া চটি। এখানে ভারবাহী ছাগ প্রথম দেখিতে পাইলাম। পার্ব্বত্য অঞ্চলে ছাগ দ্বারা ভার বহন করা হয়, ভূগোলে পড়িয়াছিলাম—অদ্য তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম। ছাগগুলি বঙ্গদেশের ছাগ অপেক্ষা আকারে বড় ও বলিষ্ঠ, সমস্ত অঙ্গ লম্বা লম্বা লোমে আবৃত। কতকগুলির রঙ ধবধবে শাদা, কতকগুলির রঙ কালো। পৃষ্ঠের দুইদিকে শস্যাদিপূর্ণ দুইটি চামড়ার বা চটের থলে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই ভার পিঠে করিয়া তাহারা অবলীলাক্রমে পর্ব্বতের পর পর্ব্বত অতিক্রম করিতেছে। প্রত্যেককে দশ পোনের সেরের অধিক ভার দেওয়া হয় না। এক এক দলে ৩০।৪০টি ছাগ থাকে; যাইতে যাইতে রাত্রি হইলে তাহারা খোলা জায়গায় শুইয়া থাকে; প্রত্যূষে উঠিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করে। সূর্য্যের উত্তাপ বেশী হইলে তাহাদের পৃষ্ঠ হইতে ভার নামাইয়া লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহারা স্বচ্ছন্দ চিত্তে পর্ব্বত গাত্রে বিচরণ করিয়া বেড়ায় এবং পর্ব্বতজাত তৃণ ও বৃক্ষ-পত্রে উদর পূর্ণ করে। তাহাদের আহারের জন্য কাহাকেও কোন কষ্ট পাইতে হয় না। আবশ্যকমত চালকের ইঙ্গিতে সকলে একস্থানে আসিয়া জড় হয়। থলেগুলি আবার পৃষ্ঠে চাপান হয়। তাহারা লাফাইতে

লাফাইতে গন্তব্যস্থানে যাইতে থাকে। পর্ব্বতগাত্রে সারিবদ্ধ ছাগের দল দূর হইতে সুন্দর দেখায়।

খাঁকরা চটীতে যথেষ্ট পরিমাণ দুধ পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে গরুর দুধ প্রায় মিলে না। মহিষের দুধই বেশী পাওয়া যায়। খাঁকরা চটি অতিক্রম করিয়া একটি সেতু পার হইতে হয়। পরেই একটি চড়াই। প্রায় এক মাইল চড়াইয়ের পর দুই মাইল উতরাই করিয়া নরকোটা চটি। এখানে শ্রীশ্রী৺কালীদেবীকে প্রণাম করিয়া একটি চড়াইয়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। দেবীর মন্দিরটি বন্যার স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। হরিদ্বার হইতে ৯১॥০ মাইল পরে গরুড় দেবের মন্দির। পরেই উতরাই। পর্ব্বতশৃঙ্গে বিমলধবল তুষাররাশি সূর্য্যকিরণে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া নয়নপথের পথিক হইল। প্রায় তিন মাইল পরে গুলাবরায় চটি। নিকটেই জলের ঝরণা। দোকানে জল খাবার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় আটা, ঘি, চাউল, ডাল সবই পাওয়া যায়। হরিদ্বার হইতে ৯৬ মাইল দূরস্থিত রুদ্রপ্রয়াগে উপনীত হইলাম। রুদ্র প্রয়াগের নিকট অলকনন্দার উপর একটি লৌহসেতু পার হইতে হয়।

রুদ্রপ্রয়াগ অলকনন্দা ও মন্দাকিনীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। স্থানটি সমুদ্রবক্ষ হইতে ১৯১২ ফিট উচ্চে। অলকনন্দা বদরীনাথ হইতে, মন্দাকিনী কেদারনাথ হইতে আসিয়া এখানে মিশিয়াছেন; একটি সোপান-শ্রেণী অবলম্বন করিয়া যাত্রীপথ হইতে সঙ্গমস্থলে নামিতে হয়। সোপান শ্রেণী পাহাড় কাটিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে। সোপানশ্রেণীর ঠিক উপরেই রুদ্রদেবের মন্দির। জনপ্রবাদ, মহর্ষি নারদ এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। রুদ্রপ্রয়াগ কেদারখণ্ডস্থিত পঞ্চ প্রয়াগের মধ্যে অন্যতম। অন্যান্য প্রয়াগ গুলির নাম—দেবপ্রয়াগ, বিষ্ণুপ্রয়াগ, নন্দপ্রয়াগ, ও কর্ণপ্রয়াগ। এখানে

ধর্ম্মশালা, ডাকঘর ও সরকারি বাঙ্গালা আছে। ছোট্ট খাট একটি বাজার দেখিতে পাওয়া গেল। অনেকগুলি দোকান। এখান হইতে একটি রাস্তা মন্দাকিনীর ধার দিয়া ৺কেদারের দিকে গিয়াছে। আর একটি রাস্তা অলকনন্দার ধার দিয়া ৺বদরীর দিকে গিয়াছে। দুই মাইল দূরে অলকনন্দা তীরে কোটেশ্বর মহাদেব দ্রষ্টব্য। পাণ্ডবগণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রকাশ।

অলকনন্দার ঠিক উপরেই একটি দ্বিতল কক্ষে আমরা বাসা লইলাম। অতি নিম্নে অলকনন্দা উৎকণ্ঠিতচিত্তে মন্দাকিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ছুটিতেছেন। নিকটেই পরস্পরের সাক্ষাৎ ও প্রেমালিঙ্গন—কি মধুর! পরক্ষণেই দুই জনে মিশিয়া আনন্দ কোলাহলে চারিদিক মুখরিত করিয়া আনন্দে ফুলিয়া ফুলিয়া সমুদ্রের মত তরঙ্গ তুলিয়া আবার কেমন ছুটিয়াছেন। দোকান হইতে চাউল ও ঘৃত সংগ্রহ করা হইল। দ্রব্যগুলি উপাদেয়। এখানেও যাত্রীসংখ্যা বিস্তর। ঘরগুলি সব যাত্রীতে পরিপূর্ণ। ইহারা আমাদের বহুপূর্ব্বে হরিদ্বার হইতে রওনা হইয়াছেন।

(৬)

গুপ্তকাশী।

রুদ্রপ্রয়াগ	হইতে	ছাতৌলী—৫ মাইল।	রুদ্রপ্রয়াগ	হইতে	চন্দ্রাপুরি—১৫॥০ মাইল।
"	"	মটিয়ানা—৬॥০ "	"	"	ভৌরী—১৮ "
"	"	অগস্ত্যমুনি—১০॥০ "	"	"	কুণ্ড—২২ "
"	"	সৌড়ী—১৩॥০ "	"	"	গুপ্তকাশী—২৪ "

রুদ্রপ্রয়াগে মধ্যাহ্নভোজন সমাপন করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর প্রায় সাড়ে তিনটার সময় যাত্রা করিলাম। শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে অগ্রে ৺কেদারনাথ দর্শন কর্ত্তব্য। *

আমরা প্রথমেই ৺কেদারনাথ দর্শন মানসে কেদারনাথেরই পথ ধরিলাম। আমাদিগের রাস্তা মন্দাকিনীর বাম ধার দিয়া। ভয়ঙ্কর চড়াই ও উৎরাই পার হইয়া পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী ছাতৌলী চটিতে আসিয়া পৌঁছিলাম। এখানে আটা পাঁচ আনা সের ও ঘি ১॥০ টাকা সের বিক্রীত হইতেছে।

অপরাহ্ন ছয়টা। সূর্য্যদেব অস্তাচলগমনোন্মুখ হইয়াছেন। পর্ব্বত চূড়া সূর্য্যকিরণে অভিরঞ্জিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে, মধ্যে

---

* ততঃ কেদারভবনং গচ্ছেৎ পাপাপনুত্তয়ে।
কেদারনাথং সংপূজ্য—গৃহীতাজ্ঞাং ততঃ সুধীঃ॥
কার্য্যং বদরীকেশস্য দর্শনং শুভদায়কম্।
অকৃত্বা দর্শনং বৈশ্য কেদারস্যাঘনাশিনঃ॥
যো গচ্ছেদ্বদরীং তস্য যাত্রা নিষ্ফলতং ব্রজেৎ।
কেদারখণ্ড।

মধ্যে মেঘ আবরণে মুখ লুকাইতেছে। বৃক্ষরাজি স্বর্ণ আভরণে মণ্ডিত হইয়া নিস্তব্ধ ভাবে দেবাদিদেবের চরণ বন্দনা করিতেছে। পক্ষী সকল দিবাবসান বুঝিয়া নিজ নিজ কুলায় অভিমুখে দৌড়িতেছে। ক্রমে ক্রমে সূর্য্যদেব পাহাড়ের ওপারে নামিয়া পড়িলেন। পক্ষীগণ বৃক্ষশাখায় বসিয়া বন্দনাগীতি আরম্ভ করিল। পর্ব্বতবাসীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর হইতে পুঞ্জ পুঞ্জ ধূমরাশি কুণ্ডলী পাকাইয়া পর্ব্বতগাত্রে ঘুরিতে ফিরিতে লাগিল। গো ও মহিষের গলায় লম্বিত কাঠের ঘণ্টার শব্দ কর্ণগোচর হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে অন্ধকারের ছায়া আসিয়া পড়িল। অচিরে চন্দ্রদেব ওদিক হইতে হাসিতে হাসিতে চারিদিক প্রফুল্লিত করিয়া দেখা দিলেন। তাঁহার হাসিতে চতুর্দ্দিক পুলকিত হইল।

এখানে একদল নেপালী যাত্রীর সহিত দেখা হইল। দলটিতে কেবল একজন মাত্র পুরুষ, অবশিষ্ট সকলেই রমণী। নানা রঙের বস্ত্র পরিহিত নেপালরমণীগণ চন্দ্রকিরণে প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তাঁহারা ৺বদরীনাথ দর্শন করিবার জন্য নেপাল হইতে আসিতেছেন। এই চটিতে আর একটি নেপালী পুরুষের সহিত তাহাদের দেখা হইল। তিনি সমস্ত ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়া ৺বদরীনাথ যাইতেছেন। তাঁহাদের সহিত কথোপকথনে রাত্রি অনেক হইল। ভোজনান্তে শয়ন করিলাম।

শয্যা হইতে চন্দ্রদেবের মধুর হাসি দেখিতে লাগিলাম। আকাশ নির্ম্মল, নক্ষত্রখচিত। নিম্নে চতুর্দ্দিকে বৃক্ষরাজিপূর্ণ পর্ব্বতশ্রেণী। প্রকৃতি দেবী যেন কালাপাড় ধবধবে সাদা একখানি সাড়ী পরিয়া মাথায় মূল্যবান সাঁচ্চার কাজকরা ওড়না জড়াইয়া নির্জ্জনে শ্রীভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন। পাছে সে

ধ্যানের কোনরূপ বিঘ্ন হয় তাই বুঝি সারা জগৎ আজ এত নীরব—বাতাসও বুঝি নিশ্চল। অদূরে নির্ঝরিণী কেবল কুলু কুলু নিনাদে প্রকৃতির সেই সাত্ত্বিকী পূজার মন্ত্রপাঠ করিতেছে। নির্ণিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলাম—বুঝি সহস্রলোচন হইলেও এ দৃশ্য দেখিয়া পরিতৃপ্তি হয় না। সৌন্দর্য্যের আকর হিমালয়—তোমার ক্রোড়ে বসিয়া দিন দিন ভগবানের কতই বিচিত্র রূপ দেখিলাম।

২৯শে বৈশাখ সোমবার। প্রাতে ছাতোলি ছাড়িলাম। দেড় মাইল দূরবর্ত্তী মঠিয়ানা চটি অতিক্রম করিয়া পুনশ্চ দেড় মাইল পরে রাস্তার কিঞ্চিৎ উপরে পর্ব্বত মধ্যে বালকেদার দেবের মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দিরটি বহু পুরাতন। ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। মেরামত না হইলে একেবারে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা। তথা হইতে বাহির হইয়া আড়াই মাইল দূরস্থিত অগস্ত্যমুনি চটীতে আসিয়া পৌছিলাম। চটিটি মন্দাকিনীর বাম উপকূলে অবস্থিত। স্থানটি দেখিয়া বোধ হইল যেন পুরাকালে এখানে একটি হ্রদ ছিল। জল শুকাইয়া গিয়াছে। প্রবাদ, এখানে অগস্ত্য মুনি তপস্যা করিয়াছিলেন। একসময়ে তিনি নাকি সমুদায় জল গণ্ডুষ করিয়া পান করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার একটি মন্দির আছে। মন্দিরটির চারিদিকে প্রাঙ্গণ ও প্রাঙ্গণের চারিদিকে ঘর। এখানে অনেকগুলি মূর্ত্তি আছে—তন্মধ্যে নৃসিংহদেবের ও মহাভারত আদিপর্ব্বে কথিত শৃঙ্গী ঋষির মূর্ত্তি উল্লেখযোগ্য। প্রাঙ্গণের মধ্যে একটী ছোট স্তম্ভ। ইহা আটপলে, মস্তক ও তলদেশ চৌকা ধরণের। মস্তকের চারিদিকে চারিটি চক্র আছে, তাহাদিগকে লোকে ব্রহ্মচক্র বলে। স্তম্ভের নিকটেই কতকগুলি সুন্দর সুন্দর পাথরের চক্র ও পদ্ম রহিয়াছে দেখিলাম। বোধ হইল এগুলি মন্দিরের কোন অংশ হইতে স্থানচ্যুত হইয়াছে। পাণ্ডারা একটি চৌকা পাথর ও

তাহাতে লাগান ঠেসান দিবার মতন আর একটি পাথর দেখাইয়া বলেন যে ইহা রামচন্দ্রের আসন। নিকটেই নবগ্রহ, নারদ ও গণেশের মূর্ত্তি। মন্দির হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে লক্ষ্মী নারায়ণের মূর্ত্তি। অদূরে আরও অনেকগুলি সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কতকগুলি বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়।

আড়াই বা তিন মাইল দূরে সৌড়ী চটি। নিকটেই মন্দাকিনী তীরে একটি সুন্দর পরিপাটী বাগান। কদলী ও পিয়ারা গাছে পূর্ণ। দেখিয়া আমাদের বাঙ্গালা দেশের কথা মনে পড়িল। বাগানের মধ্যে শিব মন্দির। মন্দাকিনীর ঠিক ধার দিয়া যাইতে লাগিলাম। সম্মুখে চন্দ্রা নদী। একটি ভাঙ্গা সেতু দিয়া পার হইলাম। খানকতক তক্তা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে—তাহাই পুলের কার্য্য করিতেছে। পুলের মাশুল লোক প্রতি এক পয়সা ও ঝাঁপান প্রতি ৵০ দিতে হয় কেদার বা বদরী নারায়ণের পথে আর কোথাও পুল পার হইবার জন্য মাশুল দিতে হয় না। এখানে কেন যে সে প্রথার ব্যতিক্রম হইয়াছে বলিতে পারি না—কেহ কেহ বলিল, একটি শক্ত পুল করিবার জন্য এই মাশুল লওয়া হইতেছে।

রুদ্রপ্রয়াগ হইতে ১৫ মাইল আসিয়া পড়িলাম। নিকটেই চন্দ্রাপুরি চটি, চন্দ্রা ও মন্দাকিনীর সঙ্গমস্থল। চটিতে অনেকগুলি ঘর আছে। নিকটেই একটি স্রোতের সাহায্যে জাঁতা চালাইয়া গম পেশা হইতেছে, দেখিবার জিনিষ। এইরূপ যন্ত্র হৃষিকেশ হইতে রাস্তায় অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। স্রোতের সম্মুখেই একটি পরিষ্কার ঘর দেখিয়া আমরা আশ্রয় লইলাম। সিমলা জেলাবাসী একটি যাত্রী হরিদ্বার হইতে আমাদের সঙ্গী হইয়াছেন। তিনি বরাবর আমাদের সঙ্গে

আসিতেছেন। স্ত্রী ও পুত্র মারা যাওয়াতে শোকে অভিভূত হইয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন—যদি শান্তি পান। এখানে আসিয়া তাহার কয়েকবার দাস্ত হইল। সঙ্গে আত্মীয় স্বজন কেহই নাই, তিনি একাকী। মনে বড় ভয় হইল। ভায়ার সঙ্গে কবিরাজি মতে হজমি গুলি ছিল। তাহাকে খাইতে দেওয়া হইল। খাইয়া তিনি কতকটা সুস্থ বোধ করিলেন এবং ঘুমাইয়া পড়িলেন। আমরা স্রোতের জলে স্নান করিয়া লইলাম। এদিকে খিচুড়ী প্রস্তুত। খুব ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে—খিচুড়িও বেশ উপাদেয় হইয়াছে—সুতরাং ভোজন যেন বড়ই গুরুতর হইয়া পড়িল। প্রায় দুই ঘটিকার সময় পীড়িত যাত্রীটি শয়ন হইতে উঠিলেন। তাহার শরীর খোলসা হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া বার্লি পথ্য বন্দোবস্ত করা গেল। বার্লি আমাদের সঙ্গে ছিল। বার্লি খাইয়া একটু আরাম পাইলেন।

প্রায় তিনটার সময় আমরা চন্দ্রাপুরি ছাড়িলাম। পথে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে নারায়ণ চটীতে পৌছিলাম। চটটি নূতন হইয়াছে। একটি মাত্র ঘর। এখানে একদল বাঙ্গালী যাত্রীর সহিত দেখা হইল। তাহারা কিছু পূর্ব্বে আশ্রয় লইয়াছেন। দলের মধ্যে সকলেই রমণী। একটি মাত্র পুরুষ। স্থান কম থাকায় বৃষ্টি থামিবামাত্র আমরা আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। মন্দাকিনীর লৌহ সেতু পার হইয়া রুদ্রপ্রয়াগ হইতে কিঞ্চিদধিক ১৮ মাইল দূরে ভেরী চটি পাইলাম। ঝাঁপানিওয়ালাদিগের মধ্যে একজনের শরীর অসুস্থ হইয়াছে দেখিয়া এই স্থানেই রাত্রিবাস করা বিধেয় মনে করিলাম। নদীর উপরেই একটি দ্বিতল ঘরে বাসা লইলাম। ঝাঁপানীওয়ালারা বার্লি ও হজমিগুলির উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছে। দুই চারিটা গুলির জন্য ভায়ার নিকট উমেদার। ভায়াও

সদাশু বদনে ইঞ্জমি গুলি বিতরণ করিয়া প্রয়োজনমত বালি প্রস্তুত করিয়া দিবেন বলিয়া তাহাদের আশ্বাস দিলেন। তাহাদের মুখে হাসি ধরে না। একটুতেই তাহারা সন্তুষ্ট। অদ্য দ্বাদশী। চন্দ্রদেবের মধুর মূর্ত্তি আকাশ-প্রান্তে ফুটিয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে তারকারাজি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আসর জমকাইয়া বসিলেন। সকলেই এক ভাবে অনুপ্রাণিত। সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। সকলে ঘুমাইয়া পড়িল।

৩০শে বৈশাখ মঙ্গলবার। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ভৌরী চটি হইতে যাত্রা করিয়া চারি মাইল দূরস্থিত কুণ্ড চটি অতিক্রম করিলাম। পরেই একটি চড়াই আরম্ভ। দুই মাইল চড়াই রাস্তা অতিক্রম করিয়া গুপ্তকাশীতে উপস্থিত হইলাম।

গুপ্তকাশী মন্দাকিনীর দক্ষিণ তীরে নদীবক্ষ হইতে ৮০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এখানে পোষ্ট আফিস, ধর্ম্মশালা ও যাত্রী থাকিবার জন্য অনেকগুলি ঘর আছে। যাত্রীপথের পার্শ্বে অনেকগুল দোকান, নানাবিধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ। শীতোপযোগী বস্ত্রাদি সাজান রহিয়াছে দেখা গেল। এখান হইতে শীত অনুভব হইয়া থাকে।

গুপ্তকাশী উত্তরাখণ্ডে একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য দেবতারা এখানে গুপ্তভাবে তপস্যা করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানটি গুপ্তকাশী নামে অভিহিত। বিশ্বনাথ এখানকার প্রধান দেবতা। তাঁহার মন্দিরটি একটি প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত। প্রাঙ্গণটির এক দিকে পর্ব্বত ও অন্য তিন দিকে যাত্রীদের থাকিবার ঘর। ঘর গুলি সব পাথরের। প্রাঙ্গণটিও পাথর বসান। বিশ্বনাথের মন্দিরের মধ্যে বিশ্বনাথ ও পার্ব্বতী। বিশ্বনাথ লিঙ্গমূর্ত্তি। পার্শ্বেই অর্দ্ধনারীশ্বরের মন্দির। মন্দির মধ্যে বদরীনাথ ও অর্দ্ধনারীশ্বর। পার্শ্বে অন্যান্য

কুঠারীতে ভৈরব ও পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি আছে। বিশ্বনাথের মন্দিরের সম্মুখে প্রাঙ্গণমধ্যে একটি কুণ্ড আছে। ইহাকে মণিকর্ণিকা কুণ্ড বলে। কুণ্ড মধ্যে অনবরত দুইটি ধারা পড়িতেছে। একটি ধারা পিতলের হস্তী মুখ বিশিষ্ট ও অপরটি গোমুখ বিশিষ্ট। হস্তীমুখী ধারার নাম যমুনা ও গোমুখী ধারার নাম গঙ্গা। এই কুণ্ডে সকলকে স্নান করিতে হয়। কুণ্ডের উদ্বৃত্ত জল একটি প্রণালী দিয়া মন্দাকিনীতে পড়িতেছে। এখানে "গুপ্তদান" নামক এক প্রকার দানের বিধি প্রচলিত আছে। যাত্রীরা কুণ্ডে স্নান করিয়া গুপ্তভাবে নারিকেলের মধ্যে নিজ ইচ্ছামত স্বর্ণ ও রৌপ্য পুরিয়া উৎসর্গ করেন। ইহা অবশ্য পাণ্ডারা পাইয়া থাকেন। পাণ্ডারা বলেন, এখানে এইরূপ ভাবে দান করিলে মহাপুণ্য লাভ হয়।

গুপ্তকাশী হইতে ১৮ মাইল উত্তর পূর্ব্বে চৌখাম্বা পর্ব্বতশৃঙ্গের পাদ দেশে মধ্যমহেশ্বর দেবের মন্দির আছে। ইহা পঞ্চ কেদারের মধ্যে অন্যতম। শীতকালে মন্দির বন্ধ থাকে। রৌপ্যনির্ম্মিত শিবমূর্ত্তি মন্দাকিনীর অপর পারে উখীমঠে আনীত হয়, এবং তথায় তাঁহার যথাবিধি পূজা হয়। শিবলিঙ্গ বরাবরই মন্দির মধ্যে থাকেন।

বিশ্বনাথের পবিত্র পুরী গুপ্তকাশীতে অদ্য মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করা গেল। পরে যথাপূর্ব্ব বিশ্রাম। মণিকর্ণিকায় অবিশ্রান্তভাবে যাত্রি গণের সমাগম দেখিতে দেখিতে দেড়টা বাজিয়া গেল। সূর্য্যের উত্তাপ তত বেশী নহে। যাত্রা করাই বিধেয়। কেদার দর্শনে সকলেই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। ক্ষণমাত্র সময় নষ্ট করিতে চাহিতেছেন না। ঝাঁপানিরাও প্রস্তুত। সকলে বাহির হইয়া পড়িলাম।

৺ কেদারনাথ

গুপ্তকাশী হইতে	নালা—১ মাইল।		গুপ্তকাশী হইতে	রামপুর—১২ মাইল।	
,,	,, ভেত বা নারায়ণ—২	,,	,,	,, ত্রিযুগীনারায়ণ—১৩	,,
,,	,, ব্যুঙ—৪	,,	,,	,, শোণপ্রয়াগ—১৪	,,
,,	,, মৈখণ্ডা—৬	,,	,,	,, গৌরীকুণ্ড—১৭	,,
,,	,, ফাটা—৭	,,	,,	,, রামবাড়া—২১	,,
,,	,, বাদল—৯	,,	,,	,, কেদারনাথ—২৫	,,

গুপ্তকাশী হইতে এক মাইল দূরে নালা চটি, দুইটি রাস্তার সঙ্গমস্থল। একটি রাস্তা ৺কেদারনাথের দিকে, অপরটি উখীমঠ হইয়া ৺বদরী-নাথের দিকে গিয়াছে। যাত্রিগণ ৺কেদারনাথ দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় এই পথ দিয়া উখীমঠ হইয়া ৺বদরীনাথ অভিমুখে গমন করেন। উখীমঠ মন্দাকিনীর অপর পারে অবস্থিত। নদী পার হইবার জন্য মন্দাকিনীর উপর ২৪৯ ফিট লম্বা একটি ঝোলান পুল (Suspension bridge) আছে। নালা গ্রামে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির দেখা গেল। প্রায় সকল গুলিই ভাঙ্গা। নালা গ্রামের এক মাইল দূরে ভেত বা নারায়ণ চটি।

নারায়ণ এক সময় বহুমন্দিরশোভিত একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। পাণ্ডারা বলেন, মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এই স্থানে বদরীশ্বর মহাদেবের উদ্দেশ্যে ৩৬০টি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কতকগুলি ভাঙ্গা মন্দির এখনও তাহার পূর্ব্বপরিচয় দিতেছে। যাত্রিপথের পার্শ্বেই বীরভদ্র ও সত্যনারায়ণ দেবের মন্দির—মন্দিরের সম্মুখেই একটি জয়স্তম্ভ ; পশ্চাতে নদীর দিকে

কতকগুলি ছোট ছোট মন্দির। রাস্তার অপর পার্শ্বে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির এবং তৎপার্শ্বে কতকগুলি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। যেগুলি এখনও দাঁড়াইয়া আছে—তাহাদের সংস্কার নিতান্ত আবশ্যক।

নারায়ণ-চটি পার হইয়া প্রায় দেড় মাইল উৎরাইয়ের পর ব্যুঙ চটি। ব্যুঙ চটির কিছু অগ্রে একটী রাস্তা মন্দাকিনী পার হইয়া কালীমঠে গিয়াছে। কালীমঠে অনেকগুলি দুর্গামন্দির আছে। এখানে ছাগ ও মহিষ বলি হইয়া থাকে। কালীমঠের নিম্নে কালী নদী প্রবাহিতা। শুনিলাম এখানকার রাজপুত অধিবাসীরা তাহাদের প্রথমা কন্যাকে দেবতার সেবায় উৎসর্গ করেন।

ব্যুঙচটি পার হইয়া সামান্য চড়াইয়ের পর ঐ নামে আর একটি ছোট চটি দেখা গেল। ক্রমে দুই মাইল দূরবর্ত্তী মৈখণ্ডা চটিতে উপনীত হইলাম। এখন কেবল চড়াই। চটিটি একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে নির্ম্মিত। রুদ্রপ্রয়াগ হইতে ৩০ মাইল। এখানে মহিষমর্দ্দিনীর একটি মন্দির আছে। দেবীর মন্দিরের ভিতর আলোক প্রবেশের কোন পথ নাই। একটি দর্পণে বাহিরের আলোক প্রতিবিম্বিত হইয়া দেবীমূর্ত্তি আলোকিত করে—তাহাতে দেবীর দর্শনলাভ হয়। যাত্রীদের ঘর চারি পাঁচটির অধিক হইবে না। মন্দিরের সম্মুখের প্রাঙ্গণটি একটু প্রশস্ত। একবারে ঠিক খাড়া পাহাড়ের উপর একটি লৌহ শিকলের দোলনা। যাত্রীরা এই দোলনার দোল খাইয়া থাকেন।

ক্রমে অগ্রসর হইয়া এক মাইল দূরে ফাটা চটিতে উপনীত হইলাম। পথিমধ্যে দুইটি পরিষ্কার জলের ধারা ও একটি শিবালয় দেখিতে পাওয়া যায়। ফাটা চটিটি একটি বড় চটি। অনেকগুলি ঘর আছে। সর্ব্ব প্রকার খাদ্যদ্রব্যের এমন কি মিষ্টান্ন প্রভৃতিরও অনেকগুলি দোকান রহিয়াছে।

একটি জলপ্রবাহ চটির মধ্য দিয়া বহিয়া যাইতেছে। আমরা একটি পরিষ্কার দ্বিতল ঘর মনোনীত করিয়া লইলাম। সম্মুখেই জলের পাইপ। জল সুস্বাদু। ৺কেদারনাথ হইতে ফেরত অনেকগুলি যাত্রীর সহিত এখানে দেখা হইল। তাহারা সকলেই একবাক্যে বলিল এখান হইতে ৺কেদারনাথ পর্য্যন্ত রাস্তাটী বড়ই দুর্গম এবং এই দুর্গমতার নানারূপ ভয়াবহ বিবরণ দিয়া আমাদের মনে ভীতি সঞ্চারের চেষ্টা করিল, আমরা এই চটিতে রাত্রিযাপন করিতে মনস্থ করিলাম।

পাহাড়ের ঠিক গায়েই আমাদের ঘর। রাত্রিতে যখন রন্ধন হইতেছে তখন উনুনের নিকট একটি গর্ত্ত হইতে সাপের শব্দের ন্যায় চিড়িক্ চিড়িক্ শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। এই শব্দ কিসের হইতে পারে তাই লইয়া আমরা নানা কল্পনা জল্পনা করিতেছি এমন সময় শঙ্কর আসিয়া আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও গর্ত্তের মধ্যে হাত প্রবেশ করাইয়া দিল এবং একটি পতঙ্গ বাহির করিয়া আমাদের অমূলক আশঙ্কার নিরাস করিয়া দিল।

৩১ বৈশাখ বুধবার। প্রাতে যাত্রা করিয়া বরাসু, বাদলপুর অতিক্রম করিয়া ৫ মাইল দূরস্থিত রামপুর চটিতে পৌছিলাম। ইহা একটি বড় চটি। প্রায় এক মাইল পরে একটি পুল পার হইতে হইল। পুলের ঠিক নিম্নে স্রোতের সাহায্যে নানারূপ কাঠের জিনিষ প্রস্তুত হইতেছে; জিনিষগুলি বড়ই সুন্দর। তন্মধ্যে বাটি ও কমণ্ডলু উল্লেখযোগ্য। যাত্রীরা প্রায় সকলেই নিজের ইচ্ছামত এক একটি সংগ্রহ করিয়া লইলেন। পুল হইতে প্রায় সিকি মাইল চড়াইয়ের পর বাম দিকে একটি রাস্তা ত্রিযুগীনারায়ণের দিকে গিয়াছে। আমরা ৺কেদারনাথের রাস্তা ছাড়িয়া ত্রিযুগীনারায়ণের দিকে যাইতে লাগিলাম। ত্রিযুগীনারায়ণের রাস্তাটি ভাল নয়—ভয়ানক চড়াই। অতি কষ্টে দুই মাইল রাস্তা চলিয়া ৺শাক-

গরী দেবীর মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে দেড় মাইল দূরে ত্রিযুগীনারায়ণ। ত্রিযুগীনারায়ণ একটি বড় গ্রাম। এখানে থাকিবার কোন কষ্ট নাই। যাত্রীদের থাকিবার জন্ম বড় বড় ঘর অনেকগুলি আছে; নিকটেই একটি পরিষ্কার ধর্ম্মশালা। মিষ্টান্নের দোকানে পুরি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। এখান হইতে একটি রাস্তা জঙ্গলের ভিতর দিয়া টিহিরির দিকে গিয়াছে। রাস্তাটি ভাল নয়, দুর্গম। এখান হইতে গঙ্গোত্তরী যাইতে হইলে এই রাস্তা ধরিতে হয়। এই রাস্তা এখান হইতে ৬৮ মাইল দূরে দেহরাগঙ্গোত্তরী রাস্তায় ভটবাড়ী নামক স্থানে মিলিয়াছে। গ্রামের শেষ দিকে ত্রিযুগীনারায়ণ-দেবের মন্দির। মন্দির মধ্যে অষ্টধাতু-নির্ম্মিত শ্রীশ্রী৺নারায়ণ-দেব, পার্শ্বে লক্ষ্মীদেবী ও সম্মুখে একটি অগ্নিকুণ্ড। পাণ্ডারা বলেন, এই কুণ্ডে তিন যুগ ধরিয়া অগ্নি প্রজ্জলিত রহিয়াছে। দুই তিনটি ব্রাহ্মণ তাহার চতুর্দ্দিকে সমস্ত দিবারাত্রি উপস্থিত থাকিয়া কাঠ দিয়া থাকেন। যাত্রীরা সাগ্রহে কুণ্ডের ছাই কপালে লেপন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়া থাকেন। প্রবাদ সত্যযুগে এখানে শিব ও পার্ব্বতীর বিবাহ হইয়াছিল এবং বিবাহ কালে হোমের জন্ম যে অগ্নি জালা হইয়াছিল তাহা আর নিবাণ হয় নাই।

মন্দিরের বাহিরেও কতকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের সম্মুখে ও পার্শ্বে চারিটি কুণ্ড আছে। তন্মধ্যে বিষ্ণুকুণ্ড, রুদ্রকুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড উল্লেখযোগ্য। এই কুণ্ডগুলিতে স্নান করিতে হয়। শুনিলাম কুণ্ডগুলিতে অনেকগুলি সাপ আছে। কিন্তু তাহাদের বিষ নাই। পাণ্ডারা বলে স্নান করিবার সময় যদি তাহারা গাত্রস্পর্শ করে তাহা হইলে প্রভু মঙ্গল হয়। কুণ্ডের পার্শ্বে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির আছে।

ত্রিযুগীনারায়ণে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর অপরাহ্ণ দুই ঘটিকার সময় বাহির হইয়া পড়িলাম। এক মাইল না যাইতে যাইতে মুষল ধারে বৃষ্টি, সঙ্গে শিলাপাত। বড় বড় শিলায় চারিদিক একেবারে সাদা হইয়া গেল। তাড়াতাড়ি যাইয়া শাকম্বরী দেবীর মন্দিরে আশ্রয় লইলাম। অনেক যাত্রী বৃষ্টিতে ভিজিয়া এখানে আশ্রয় লইলেন। অন্যূন এক ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিতে হইল। বৃষ্টি থামিলে আবার রাস্তা ধরিলাম। ভীষণ উৎরাই। পথ বৃষ্টিতে পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছে, অতি সন্তর্পণে নামিতে লাগিলাম। অনেকে পা ঠিক রাখিতে না পারিয়া পড়িয়া যাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ গুরুতর আঘাতও পাইলেন, অতিকষ্টে নামিয়া মন্দাকিনী ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে রুদ্রপ্রয়াগ-কেদারনাথ রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিলাম। শোণ নদীকে বাসুকীগঙ্গাও বলে। একটি লৌহনির্ম্মিত ঝুলান সেতুর সাহায্যে শোণ নদী পার হইয়া আবার চড়াইয়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। সেতুটি ১৯১৩ সালে নির্ম্মিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যাত্রিভারে পুরাতন সেতুটি ভাঙ্গিয়া যায়। তাহাতে অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং অনেকে আহত হন।

অর্দ্ধ মাইল অতিক্রম করিয়া "মুণ্ডকাটা গণেশের" * সাক্ষাৎ পাইলাম।

*বৈনায়কং তথা দ্বারং সংস্থিত্য সংস্থিতঃ শিবে।
গণেশস্তাবকঃ পুত্র অঙ্গরাগেণ যঃ কৃতঃ ॥
স্থাপিতো দ্বারি দেবেশি ত্বয়া চ স্নাপ্যমানয়া।
ময়া যস্য শিরশ্ছিন্নং পতিতং শিবক্ষেত্রকে ॥
প্রসন্নেন ময়া দেবি পুনঃ করিবরং শিরঃ।
সংযোজিতং তদঙ্গে তু ততো গজমুখোঽভবৎ ॥
সংপূজ্য তং গণেশং বৈ নানানৈবেদ্যদ্রব্যকৈঃ।
গচ্ছেন্মম মহাস্থানে যত্র গত্বা শিবো ভবেৎ ॥
স্কন্দপুরাণ।

এখান হইতে তিন মাইল দূরে গৌরীকুণ্ডচটি। গৌরীকুণ্ডচটিও একটি বড় চটি। রাস্তার দুই পার্শ্বেই অনেকগুলি ঘর। ঘরগুলি সবই প্রায় দ্বিতল। নিম্নে দোকান। উপরে যাত্রীদের থাকিবার স্থান। এখানে হরপার্ব্বতীর একটি মন্দির আছে। নিকটেই দুইটি কুণ্ড। একটি শীতল জলের, অপরটি গরম জলের। কুণ্ডগুলি পাথর দিয়া বাঁধান। এ দারুণ শীতের দেশে গরম জল যে কত আদরের এবং কত মূল্যবান তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এখানে কুণ্ডের গরম জলে স্নান করা কি আরামের তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। এ যেন ভগবানের দান। মাটির ভিতর দিয়া গরম জলের স্রোত অনবরত কোথা হইতে আসিয়া কুণ্ডটি পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। গোমুখাকৃতি পিতলের একটা মুখ দিয়া কুণ্ডের মধ্যে অনবরত জল পড়িতেছে; উদ্বৃত্ত জল অন্য দিক দিয়া বাহির হইয়া মন্দাকিনীতে যাইয়া পড়িতেছে। ঠাণ্ডা জলের কুণ্ডটির জল হরিদ্রাবর্ণ। প্রবাদ, পার্ব্বতী এই কুণ্ডে ঋতু-স্নান করিয়াছিলেন, তাই ইহার নাম গৌরীকুণ্ড*।

*ত্রিগুব্যাতো মম স্থানাদ্দক্ষিণে শৃণু তীর্থকম।
গৌরীতীর্থমিদং খ্যাতং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম ॥
যত্র ত্বয়া মহেশানি মন্দাকিন্যাস্তটে পুরা।
ঋতুস্নানং কৃতং তদ্বৈ গৌরীতীর্থমিতি স্মৃতং ॥
মহাসেনস্য উৎপত্তো বিস্মৃতং কিং ত্বয়ানঘে।
তস্মাচ্চিহ্নং প্রবক্ষামি যেন তজ্জায়তে শুভং ॥
কটূষ্ণং তু জলং তত্র সিন্দুরাভা তু মৃত্তিকা।
তৎস্থানং দেবদেবেশি ন ত্যজামি কদাচন ॥
কেদারখণ্ডঃ।

এই চটিতে আমরা রাত্রিযাপন করিলাম। শীতের জন্য রাত্রিতে কম্বল গায়ে দিতে হইয়াছিল। ৺ কেদারনাথ হইতে ফেরত অনেকগুলি যাত্রীর সহিত এখানে সাক্ষাৎ হইল। সকলেরই মুখে সেই এক, কথা রাস্তা বড় দুর্গম।

১লা জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার। প্রাতে গৌরীকুণ্ড ছাড়িয়া চড়াইয়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। রাস্তা ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া চীরবাসা ভৈরবের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে ভৈরবজীকে ছিন্ন বস্ত্র দ্বারা পূজা করিতে হয়, না করিলে তিনি যাত্রীর সমস্ত ফল হরণ করেন*।

এইবার সারণ চটি। রাস্তা ক্রমে দুর্গম হইয়া আসিতে লাগিল, স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহা হইলেও কাণ্ডী, ঝাঁপান, দাণ্ডী সকলই যাতায়াত করিতেছে। এইবার বরফ আরম্ভ, স্থানে স্থানে রাস্তা বরফে আবৃত। নীচে জলস্রোত বহিয়া যাইতেছে, উপরে তুষাররাশি। তাহার উপর দিয়া যাইবার পথ; পর্ব্বতগাত্রে সংলগ্ন এইরূপ রাস্তা দিয়া যাতায়াত বড়ই বিপজ্জনক, পা ঠিক রাখিতে পারা যায় না, পড়িয়া যাইবার আশঙ্কা হয়। আবার মাঝে মাঝে ফাঁপা বরফের আচ্ছাদনটি ভাঙ্গিয়া নিম্নস্থিত জলের মধ্যে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। যাইতে যাইতে ভীমের এক বিশাল প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। পাণ্ডারা বলেন, মহাপ্রস্থানকালে

---

*গৌরীতীর্থাদূর্দ্ধভাগে পর্ব্বতে সৌম্যদিকস্থিতে।
চীরবাসা ভৈরবস্তু ক্ষেত্রং রক্ষতি মামকম॥
তস্মৈ চীরাদিকং দত্ত্বা সর্ব্বং পুণ্যং লভেন্নরঃ।
অন্যথা তৎফলং সর্ব্বং হরতে, ভৈরবঃ শিবঃ॥
কেদারখণ্ড।

ভীম এইখানে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। এখান হইতে এক মাইল দূরে রামবাড়া। রাস্তা হইতে নদীর অপর পারের পর্ব্বতগাত্রে প্রস্রবণগুলির দৃশ্য এতই মনোহর যে সেদিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইতে ইচ্ছা করে না। পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অসংখ্য জলধারা পর্ব্বতগাত্র বহিয়া পড়িতে পড়িতে জমিয়া গিয়াছে। পর্ব্বতগুলি এইরূপ তুষারাভরণে সজ্জিত হইয়া এক অসামান্য সুষমার সৃষ্টি করিয়াছে।

স্থানে স্থানে ভীষণ জলপ্রপাত, কোথাও বা নানাবর্ণের পত্রশোভিত বৃক্ষরাজী, কোথাও বা নানাবর্ণের প্রস্ফুটিত কুসুমদামশোভিত পুষ্পবৃক্ষের শ্রেণী। যাত্রিগণের পথক্লেশ অপনোদনের জন্য প্রকৃতিদেবী যেন সাজাইয়া রাখিয়াছেন। আবার এদিকে উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা ও আকাশভেদী মহীরুহচয় পথিকগণের ভীতি উদ্রেক করিতেছে, সৌন্দর্য্য ও ভীষণতার সংমিশ্রণে যে এক অপূর্ব্ব শ্রী পথিকগণের নয়নরঞ্জন করিয়া থাকে তাহা কেবল উপভোগ করা যায়, বর্ণনা করা যায় না।

রামবাড়া আর একটি বড় চটি। পোষ্টঅফিস, আহারীয় দ্রব্যের দোকান ও যাত্রীদের থাকিবার উপযোগী অনেকগুলি বড় বড় পরিষ্কার ঘর আছে। যাইবার ও ফিরিবার সময় যাত্রীরা প্রায় এইস্থানে বিশ্রাম করেন। সকল সময়েই চটিটি যাত্রীতে পরিপূর্ণ। কুলীরা ভারি ভারি জিনিষ এইখানে রাখিয়া যায়। ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া চড়াই উঠিতে আরম্ভ করিলাম, রাস্তা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, স্থানে স্থানে ভাঙ্গা। মেরামতের বন্দোবস্ত আছে সত্য কিন্তু একস্থানের মেরামত শেষ হইতে না হইতে, অন্য স্থানে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। রাস্তা ঠিক রাখা বড়ই কঠিন। প্রকৃতিদেবী যেন সর্ব্বদাই রাস্তাগুলির চিহ্ন মুছিয়া দিতেই প্রয়াসবতী, তাহার উপর অধিকাংশ রাস্তা বরফে আচ্ছন্ন। পর্ব্বত, নদী, চারিদিকে শাদা ধব্ ধব্ করিতেছে।

তি কষ্টে ও সাবধানে মাঝে মাঝে বিস্তৃত তুষার-ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া বেলা একটার সময় মন্দাকিনী-তীরে ৺কেদারনাথধামে আসিয়া পৌঁছিলাম। অপূর্ব্ব দৃশ্য। চতুর্দ্দিকে তুষারধবল পর্ব্বতের শ্রেণী মধ্যে ৺কেদারনাথের মন্দির।

৺কেদারনাথের মন্দির সমুদ্র-বক্ষ হইতে ১১৭৫৩ ফিট উচ্চে। মহাপথ নামক পর্ব্বত-শিখরের ঠিক নিম্নে একটি চিরতুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তাহা হইতে একটি জাঙ্গাল বাহির হইয়াছে। এই জাঙ্গালে মন্দাকিনীর তীরে উপত্যকার উপর দিকে একটি সমতল ভূমির উপর মন্দিরটী নির্ম্মিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে স্থানটী বড়ই মনোরম। মন্দির প্রস্তর-নির্ম্মিত। সুন্দর স্বর্ণ-চূড়াশোভিত। মন্দিরের দ্বার দক্ষিণ দিকে। দরওয়ার দুই পার্শ্বে সম্মুখের দেওয়ালে কোলঙ্গা এবং নানা দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি। সম্মুখে এক প্রস্তরনির্ম্মিত বৃষ। মন্দিরটী তিন ভাগে বিভক্ত। ভিতরের অংশে শ্রীশ্রী৺কেদারনাথের লিঙ্গমূর্ত্তি। আমরা সচরাচর যেরূপ লিঙ্গমূর্ত্তি দেখি ইহা সেরূপ নহে। ইহা একটি কৃষ্ণবর্ণ পাথরের চাঙ্গড়। তলদেশ প্রশস্ত এবং উপরিভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম। যাত্রিগণ চতুষ্কোণবিশিষ্ট গৌরীপিঠের উপর এই বিশাল লিঙ্গমূর্ত্তিতে ঘৃত মাখাইয়া থাকেন এবং উৎকট পাপ ও মহাব্যাধি হইতে পরিত্রাণ পাইবার মানসে এই লিঙ্গমূর্ত্তিকে আলিঙ্গন করেন। মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিয়া সকলেই এই লিঙ্গমূর্ত্তি স্পর্শ করিতে পারেন। তাহাতে কোন বাধা নাই। পাণ্ডারা বলেন, এই কৃষ্ণবর্ণ পাথরের চাঙ্গড় সদা-শিবের পশ্চাদ্ভাগ। তুঙ্গনাথে তাঁহার বাহু, রুদ্রনাথে মুখ, মধ্য মহেশ্বরে নাভি, এবং কল্পেশ্বরে জটা পূজিত হইয়া থাকেন। এই পঞ্চ কেদার দর্শন ও পূজন মহা সৌভাগ্যসাপেক্ষ, সকলের ভাগ্যে ঘটে না! মন্দিরে কোন

জানালা নাই। সম্মুখস্থ বৃহৎ দরজা হইতে যে আলোক প্রবেশ করে তাহাই যথেষ্ট। মন্দির মধ্যে সর্ব্বদাই টুপটাপ জল পড়িতেছে।

মধ্যভাগে শ্রীশ্রী৺পার্ব্বতী দেবী ও শ্রীশ্রী৺লক্ষ্মী দেবী এবং সম্মুখ ভাগে পঞ্চ পাণ্ডব, দ্রৌপদী, কুন্তী, নন্দী, ও প্রমথগণের মূর্ত্তি আছে।

মন্দিরের নিকটে অনেকগুলি পবিত্র কুণ্ড আছে। অমৃতকুণ্ড, সুফল-কুণ্ড, হংসকুণ্ড, রেতঃকুণ্ড ও উদককুণ্ড। এই উদককুণ্ড ব্যতীত আর কোন কুণ্ড দর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। অপরগুলি বরফে ঢাকা। কতকগুলি প্রান্তবাহিনী নদীরও নাম শুনিলাম, ক্ষীর* মহোদধি, সরস্বতী, স্বর্ণদ্বারী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনটারই দর্শন পাইলাম না। সকলগুলিই তুহিনাবরণের ভিতর দিয়া প্রবাহিতা।

মন্দাকিনীও তুষারের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। স্নানঘাটের কোন চিহ্ন নাই।

মন্দিরের সম্মুখে একটি রাস্তা আছে। তাহার দুই পার্শ্বে কেবল সারিবদ্ধ পাথরের ঘর। প্রায় সবগুলিই দ্বিতল। প্রথম তালাটি এখনও বরফের মধ্যে। দ্বিতীয় তলের ছাদে এখনও বরফের স্তূপ। বরফ কাটিয়া ঘর বাড়ী বাহির করা হইতেছে। মন্দির হইতে চারি মাইল দূরে মহাপথ-শেখরের রাস্তায় ভৈরবঝম্প নামক একটি খাড়া পাহাড় আছে। মোক্ষপ্রাপ্তির আশায় সন্ন্যাসীরা এখান হইতে ঝাঁপ দিতেন, ঝাঁপ দিবার পূর্ব্বে সন্নিহিত মন্দির-গাত্রে নিজ নিজ নাম লিখিয়া যাইতেন ইহা এক্ষণে

*"ক্ষীরগঙ্গাতু যা ধারা মন্দাকিন্যাস্তু সঙ্গমে,
শিবপ্রদং মহাতীর্থং ক্রোঞ্চ হর্ত্তুঃ প্রকীর্ত্তিতং
যত্র স্নাত্বা বরারোহে কৈলাস নিলয়ে বসেৎ।"
কেদারখণ্ড।

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ। আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে বরফের নদী দেখিতে পাওয়া যায়। এই বরফের নদী হইতেই মন্দাকিনীর উৎপত্তি। মহাপথের অপর পার্শ্বে শ্রীশ্রী৺বদরিকাশ্রম। পূর্ব্বে এক পুজারিই শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ ও শ্রীশ্রী৺বদরীনারায়ণ দেবের পূজা করিতেন, কিন্তু এক্ষণে শ্রীশ্রী৺কেদারনাথ হইতে শ্রীশ্রী৺বদরিনাথ যাইতে সাত আট দিন লাগে। পাণ্ডারা বলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে কেদারনাথ হইতে বদরিকাশ্রম যাইতে যে একটি সোজা রাস্তা ছিল, তাহাতে দুই তিন দিন মাত্র লাগিত; কিন্তু এক্ষণে পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া সে পথও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

৺কেদারনাথের মহান্ত রাওল নামে অভিহিত। তিনি উখীমঠে অবস্থান করেন; বেতনভোগী পূজারী দ্বারা পূজাদি সমাহিত হয়। পূজার ব্যয়ের জন্য গাড়োয়াল জেলায় ৬০টি আলমোরা ও নৈনিতাল জেলায় ৪৫টী এবং টিহরী রাজ্যের কতিপয় গ্রামের রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট আছে। কেদারনাথের মহান্ত গুপ্তকাশী, উখীমঠ ও মধ্য মহেশ্বরেরও পূজার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন।

তুষার ক্ষেত্র, তুষার কণায় পরিপূর্ণ। কণাগুলি বালির মতন। তুষার ক্ষেত্রগুলি শাদা ধব্‌ধবে বালুকা-রাশি-পরিপূর্ণ প্রান্তর বলিয়া বোধ হয়। ৺কেদারনাথপুরীর ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্বেই প্রায় এক মাইল ব্যাপী একটি তুষার ক্ষেত্র অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। ইহা বড়ই গড়ানে। মন্দির সন্নিকট ভাবিয়া প্রায় সকলেই এই তুষার ক্ষেত্রের উপর পদ ব্রজে যান। তবে খালি পায়ে ইহার উপর দিয়া যাওয়া বিপজ্জনক। শরীর একেবারে অবশ হইয়া পড়ে। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে ধনুষ্কোটী তীর্থের উত্তপ্ত বালুকারাশিপরিপূর্ণ প্রান্তরটী মনে পড়িল। একদিন দিগন্তব্যাপী উত্তপ্ত

বালুরাশির মধ্যে পড়িয়া মৃত্যুর বিভীষিকাময় ছায়া দেখিয়াছিলাম। আর আজ এখানে চিরতুসারাচ্ছন্ন পর্ব্বতের উপর অনন্তবিস্তৃত তুহিনরাশির মধ্যে দাঁড়াইয়া সেই একই বিভীষিকার ভিন্ন মূর্ত্তি নয়নগোচর করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে ভাবিতে লাগিলাম, ভগবান বুঝিবা এবার তাঁহার শান্তিময় শীতল ক্রোড়ে স্থান দিবেন, কিন্তু এখনও যে পাপের ভোগ ফুরায় নাই, এখনও যে অদৃষ্টে অনেক দুঃখ আছে, এখনও যে অনেক শোকতাপ সহিতে হইবে তাই তিনি আশ্রয় দিলেন না।

কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতুর সাহায্যে মন্দাকিনী পার হইয়া ৺কেদারনাথে উপস্থিত হইলাম; সম্মুখেই পাণ্ডা মহারাজ আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাদিগকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া একটি দ্বিতল গৃহে লইয়া গেলেন। শীঘ্রই অগ্নি জ্বালাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অগ্নি-উত্তাপে কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম। পাণ্ডা-মহারাজ যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য বহু কম্বল সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। ৭।৮টি কম্বল আসিয়া পড়িল। পাণ্ডা-মহারাজের কৃপায় গরম জলও পাইলাম। স্নান করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ঘরের মধ্যেই বসিয়া স্নান-ক্রিয়া সমাধা করিয়া লইলাম। Sweater, Waist-coat, coat যাহা কিছু শীতবস্ত্র ছিল সব পরিধান করিলাম, তথাপি শীত যায় না, পরিশেষে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম। ক্ষণেক বিশ্রামের পর ৺কেদারনাথ দর্শনের বাসনায় পাণ্ডা-মহারাজকে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু মন্দিরের দরজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তখন সে আশা ত্যাগ করিতে হইল। আহার প্রস্তুত। পাণ্ডা-মহারাজের কৃপায় ও ব্যবস্থায় নানাবিধ ব্যঞ্জন ও পোলাও দ্বারা উদরপূর্ত্তি হইল। আহারান্তে জানালায় বসিয়া প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম, চতুর্দ্দিকে শ্বেত বর্ণ, অন্ত-

কোন বর্ণ নাই। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। চড়্ চড়্ করিয়া কেবল শিলাপাত হইতে লাগিল, বৃষ্টি নাই। সন্ধ্যার সময়ই পাণ্ডা-মহারাজ ৺কেদারনাথদেবের আরতি দেখিতে যাইবার জন্য লইতে আসিলেন। গরম কাপড়ের পায়জামা, মোজা, সোএটার, ওয়েষ্ট-কোট, কোট ও অলষ্টার, পরিশেষে তদুপরি একটি কম্বল মুড়ি দিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলাম। তবুও বুকের ভিতর শীতে গুর্ গুর্ করিতেছিল।

অদ্য পূর্ণিমা, চন্দ্রদেব আকাশ প্রান্তে দর্শন দিয়াছেন। প্রকৃতির বিমল ধবল তুষাররাশির উপর পূর্ণচন্দ্রের বিমল কিরণজাল প্রতিফলিত হইয়া চারিদিকে এককালে সহস্র সুধাকরের সৃষ্টি করিল, স্ফটিক রঙ্গালয়ে যেন সহস্র পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল, সে দৃশ্য দেখিয়া ভাবিলাম এই তো ভগবান আমার সম্মুখে, আবার কোথায় যাইতেছি? এই তো প্রভু আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, এই তো আমার রজতগিরিনিভ মহেশ, এই তো আমার চারুচন্দ্রাবতংস মহেশ, এই তো আমার রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গ দেবাদিদেব। অমনি ভক্তিভরে মস্তক আপনা হইতে আনত হইয়া পড়িল—মনে মনে বলিয়া উঠিলাম

> ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
> রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নং।
> পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
> বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং ॥

মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। নির্জ্জন প্রদেশে এই ঘণ্টাধ্বনি কি মধুর!

মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে দ্বারে ছয় পয়সা জমা দিতে হয়, তাহা মন্দির-ফণ্ডে জমা হয়। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবাদিদেবকে দর্শন করিয়া

আজ যেন জীবনকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলাম। আজ যেন সকল পথশ্রম সার্থক হইল। মন্দিরের আরত্রিক আরম্ভ হইল। যথারীতি আরত্রিক শেষ হইলে ভগবান ও পূজারিকে প্রণাম করিয়া ও পূজারির নিকট আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিলাম।

পূজারি সকলকে জানাইয়া দিলেন, আগামী কল্য প্রাতে আটটার সময় দরজা খোলা হইবে। বাসায় আসিয়া লুচি আলুর দমে উত্তমরূপে ভোজন ক্রিয়া সমাধা করিয়া শয়ন করিবার বন্দোবস্ত করিলাম। প্রচণ্ড শীত, শীতের উপযোগী কম্বলাদির অভাব নাই। তত্রাপি ঘরে আগুন জ্বালাইয়া রাখিতে হইল। আমাদের ঘরে দুইটি জানালা ছিল, জানালা খুলিয়া স্বভাবের শোভা দেখিবার বড়ই কৌতূহল হইল; কিন্তু পাণ্ডা-মহারাজ পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, তিনি চলিয়া যাইলে একবার জানালা খুলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আহা মরি মরি কি সুন্দর দৃশ্য দেখিলাম!

কতক্ষণ যে এইরূপ ভাবে বসিয়াছিলাম জানি না। পরে ভগবানকে স্মরণ করিতে করিতে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িলাম। কোন সময় যে নিদ্রাদেবী অলক্ষিতে তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করিলেন বলিতে পারি না। পরদিন ২রা জ্যৈষ্ঠ প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পর শয্যা হইতে উঠিয়া যথারীতি প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিলাম এবং স্নান সমাপনান্তে ভগবৎ দর্শনে বহির্গত হইলাম। বরফের উপর দিয়া রাস্তা। রাস্তার উভয় পার্শ্বে পাকা বাড়ী, প্রথম তোলা এখনও বরফের মধ্যে, দ্বিতলটি কেবল বাহির হইয়াছে। মন্দিরের দ্বার খোলা হইল, সকলে প্রবেশ করিলাম। দেবাদিদেবের চতুষ্পার্শে দণ্ডায়মান রহিলাম। তাঁহার পূজা দেখিতে

লাগিলাম। পূজা শেষ হইল, সকলে দেবাদিদেবের আলিঙ্গন লাভে জীবন চরিতার্থ করিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, কতকগুলি লোক একখানি খাতা লইয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ৺কেদারনাথপুরীতে আসিয়া আমরা কিরূপ ভাবে আছি, আমাদের কোন কষ্ট হইতেছে কিনা, ভগবান দর্শন কিরূপ হইল, কোন অসুবিধা হইল কিনা, মন্দির রক্ষয়িতৃগণ আমাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন ইত্যাদি বিষয় ঐ খাতায় লিখিতে হয়; পুরীতে আসিবার সময় রাস্তার অবস্থাও তাহাতে লিখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলাম। ইহা ব্যতীত যাত্রিদের সুবিধার জন্য যদি কেহ কোন মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন তাহাও লিখিতে পারেন। আমরা আমাদের মন্তব্য উহাতে লিখিয়া আর একবার ভগবানকে দর্শন করিয়া মন্দিরের চত্বর হইতে অবতরণ করিলাম। মন কিছুতেই অগ্রসর হইতে চায় না। মনে হয় যেন এই স্থানেই বসিয়া জীবনের যে কয়েকটা দিন আছে ভগবচ্চিন্তায় কাটাইয়া দি। কিন্তু ভগবানের সে কৃপা নাই, ধীরে ধীরে বাসার দিকে ফিরিতে হইল। এক একবার মুখ ফিরাইয়া সেই শান্তি-নিকেতন দেখিতে লাগিলাম। উদককুণ্ড হইতে একটু জল লইয়া পান করিলাম। পূজারি মহাশয় এই স্থানে আসিয়া একটি প্রসংশাপত্র (certificate) চাহিলেন। তাঁহাকে একখানি প্রসংশাপত্র লিখিয়া দিলাম। ইহার মূল্য যে কি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যাহা হউক বাসায় ফিরিয়া তখনই তথা হইতে পুনর্যাত্রা করিতে হইবে। দুরন্ত শীতে মাতাঠাকুরাণীকে অধিক দিন এখানে রাখিতে ইচ্ছা করিতেছে না। যৎকিঞ্চিত জলযোগের আয়োজন হইল। পাণ্ডা-মহারাজ বড়ই সজ্জন। তাঁহার সহিত পাওনার নিমিত্ত কোনও বাদানুবাদ হইল না। যথারীতি তাঁহার নিকট হইতে

বিদায় গ্রহণ করিয়া ৺কেদারনাথকে স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম। পাণ্ডা-মহারাজ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিলেন। মন্দাকিনীর সেতুর উপর দাঁড়াইয়া তাঁহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।



বনশ্রী ।

(১)

লালসাঙ্গা বা চামৌলী

নালা হইতে উখীমঠ—৩ মাইল।	লালা হইতে ভুলকণা—১৭ মাইল।
„ „ ব্রহ্ম চটি—৬ „	„ „ ভীমগোড়া ১৯ „
„ „ দুর্গা——৮ „	„ জঙ্গল বা পাঙ্গরবাসা ২২ „
„ „ দরিয়া—৯ „	„ „ মণ্ডল—২৫॥০ „
„ „ পোথিবাসা ১১ „	„ „ বৈরাগণা ২৭ „
„ „ বণিয়া কুণ্ড ১৪ „	„ „ অ রাগ—২৭॥০ „
„ „ চোপতা—১৫॥০ „	„ সেটুনা বা বীরেশ ২৮॥০ „
„ „ তুঙ্গনাথ ১৮॥০ „	„ „ গোপেশ্বর ৩০ „

নালা হইতে লালসাঙ্গা বা চামৌলী—৩৩ মাইল।

কেদারনাথ ছাড়িয়া যাইতে মন সরিতেছে না। পা যেন উঠিতেছে না। অতি অনিচ্ছায়, অতৃপ্তহৃদয়ে মন্দাকিনী পার হইলাম। পুনরায় পূর্ব্ববর্ণিত তুষারক্ষেত্র পার হইয়া ক্রমে গৌরীকুণ্ড চটিতে পৌছিলে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, অদ্য এইখানেই বিশ্রাম করিলাম। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে গৌরীকুণ্ড একটি বড় চটি, আহার্য্য সামগ্রী সমুদায় পাওয়া যায়। রাত্রিতে ভোজনাদি সমাপন করিয়া প্রফুল্লচিত্তে শয়ন করিলাম।

৩রা জ্যৈষ্ঠ অতি প্রত্যূষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাধা করিলাম। তখনও জ্যোৎস্নায় চারিদিক আলোকিত, সুতরাং কোন অসুবিধা হইল না। গৌরীকুণ্ডে স্নান করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। ক্রমে গলাকাটা গণেশ, শোনপ্রয়াগ সেতু, রামপুর, বাদলপুর, বরাসুচটি অতিক্রম করিয়া ফাটা চটিতে উপনীত হইলাম। প্রায় দশটা বাজিয়া গেল। মধ্যাহ্ন আহারের বন্দোবস্ত হইল। রাস্তায় দলে দলে যাত্রী যাইতেছে ও আসিতেছে, জয় কেদারনাথ কি জয় শব্দে দিক দিগন্ত মুখরিত হইতেছে। সকলেই এক উদ্দেশ্যে চলিয়াছে, ভগবানের চিন্তা ব্যতীত কাহারও মনে অন্য কোন চিন্তা নাই। রাগ, হিংসা, দ্বেষ বুঝি বা ক্ষণকালের নিমিত্ত মানবহৃদয় হইতে অপসৃত হইয়া গিয়াছে।

অপরাহ্নে প্রত্যহই বৃষ্টি হইতেছে দেখিয়া বেলা দুইটার সময় বাহির হইয়া পড়িলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইলেই মেঘগর্জ্জনের শব্দ শোনা গেল। দুই একটা বড় বড় ফোঁটাও পড়িতে লাগিল। আমরা যথাসম্ভব দ্রুতবেগে চলিয়া প্রায় চারিটা পোনের মিনিটের সময় নালাচটিতে আসিয়া পৌঁছিলাম এখানে অর্দ্ধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। ৺বদরী নাথের রাস্তা এইস্থানে ৺কেদার নাথের রাস্তায় আসিয়া মিলিয়াছে। আমরা এখন ৺বদরী নাথের দর্শনে যাইতেছি সুতরাং এখান হইতে ৺বদরী নাথের রাস্তা ধরিলাম। প্রথমে মন্দাকিনী পার হইতে হইবে। নালা চটি হইতে অনেক কষ্টে দুই মাইল অবরোহণের পর আমরা মন্দাকিনীর সেতু পাইলাম। রাস্তা বড়ই সঙ্কীর্ণ, দুই তিন জন লোক পাশাপাশি যাইবার উপযুক্ত প্রচুর স্থান নাই। আবার এই রাস্তা দিয়াই গো মহিষাদিও যাতায়াত করে। রাস্তার একদিকে পর্ব্বতশ্রেণী আকাশ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ও অপর দিকে গভীর খাদ যেন পাতালের অন্বেষণ

করিতেছে। একটু অসাবধান হইলে, একবার পদস্খলিত হইলে, বোধ হয় একবারে মাংসপিণ্ড হইয়া যাইতে হইবে। এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া পবিত্রসলিলা মন্দাকিনীর তীরে উপনীত হইলাম। এখানে নদী পার হইবার সেতুটী অপেক্ষাকৃত নূতন, ১৯১৩ সালে নির্ম্মিত। পার হইয়া চড়াই পাইলাম। প্রায় এক মাইল চড়াইয়ের পর উখীমঠ। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতি দেবী অন্ধকারে মুখ লুকাইতেছেন। পশু পক্ষী সকলেই নিজ নিজ আবাসের সন্ধানে চলিতেছে। আমরাও একটি ঘর বাছিয়া লইয়া আমাদের পুঁটলী সকল ফেলিলাম। রাস্তার উভয় পার্শ্বে দ্বিতল সারিবদ্ধ গৃহ। নিম্নতলায় দোকান, নানাবিধ দ্রব্য সম্ভারে পরিপূর্ণ। চা পানকারীরা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে এখানে বেশ ভাল চা পাওয়া যায়। দ্বিতলের গৃহগুলি যাত্রীদিগের জন্য। আমরা একটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ঘর মনোনীত করিয়া লইলাম। ক্ষণেক বিশ্রামের পরে দেবদর্শনে বাহির হইলাম। এখানে একটি বৃহৎ মঠবাটী আছে। তথায় ৺কেদারনাথের মোহান্ত বাস করেন। মঠবাটীর সম্মুখেই একটি জমকাল ফটক। ফটকের উপর লাল ও কাল রঙের হাতীওয়ালা কার্ণিশ। কার্ণিশটি কাষ্ঠনির্ম্মিত। তোরণ পার হইয়া একটি প্রাঙ্গণে পড়িতে হয়। প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে যাত্রীদের থাকিবার ঘর। মধ্যস্থলে একটি মন্দির। মন্দির মধ্যে মান্ধাতার, ওঙ্কারেশ্বরের এবং আরও অনেকগুলি দেবতার মূর্ত্তি রহিয়াছে। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে ক্ষুদ্র একটি কুটরীতে অনিরুদ্ধ ও ঊষার মূর্ত্তি। প্রাঙ্গণের অপরদিকে একটি ঘরের ভিতর দিয়া একটী সঙ্কীর্ণ পথে মহান্ত মহারাজের গদি দেখিতে যাইতে হয়। তথায় পঞ্চমুখ কেদারেশ্বর দেবের প্রতিমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির দুইটি মুখ স্বর্ণনির্ম্মিত ও তিনটি রৌপ্যনির্ম্মিত। ইহা ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন কুটরীতে

গঙ্গা, কুন্তী, দ্রৌপদী চারি যুগের কালী ও পঞ্চ পাণ্ডবের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মোহন্ত মহারাজের কর্ম্মচারী আমাদিগকে অত্যন্ত যত্নের সহিত যাবতীয় দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখাইলেন। বাসায় ফিরিতে রাত্রি একটু বেশী হইয়া গেল।

আকাশ একটু মেঘাচ্ছন্ন ছিল, শরীরে শীত বোধ হইতে লাগিল। কম্বল মুড়ি দিয়া শয়ন করিতে হইল; সুনিদ্রার কোন ব্যাঘাত হইল না। এখানে ডিস্পেন্সারী, পুলিশ থানা ও পোষ্ট অফিস আছে। এখান হইতে ছয় মাইল উত্তরপূর্ব্বে দিউড়ীতাল নামক একটা হ্রদ আছে। ইহা বদরীনাথ হইতে উখীমঠের নিম্নবাহিনী মন্দাকিনী পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি জাঙ্গালের উপর সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৮০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। পরিধি প্রায় ৮০০ গজ হইবে। ইহার কোন অংশ অগভীর নহে; তবে উত্তরভাগের গভীরতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তীর হইতে এই হ্রদের দৃশ্য বড়ই মনোরম। ১৫ মাইল দূরস্থিত বদরিনাথ পর্ব্বতের আপাদমস্তক প্রায় সমস্তটাই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যূষে তুষারমণ্ডিত বদরিনাথ ও কেদারনাথ হ্রদের জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া দর্শকের হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত করিয়া দেয়।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ। প্রাতে উখীমঠ ত্যাগ করিলাম। তখন সূর্য্যদেব উঠেন নাই। খানিকদূর অগ্রসর হইলে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে প্রাতঃসূর্য্যের কিরণচ্ছটা নয়ন পথে পতিত হইল। সূর্য্যরশ্মি ক্রমে পর্ব্বত গাত্রে নামিয়া আসিয়া সমস্তই স্বর্ণময় করিয়া তুলিল। দূরে মহাভারতবর্ণিত বাণ রাজার রাজধানী শোণিতপুরের ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হইল। তাহার পর সত্যনারায়ণ। এখানে রাস্তা একেবারেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পর্ব্বত গাত্রে রাস্তার কোন চিহ্নই নাই। সবটুকু ধসিয়া একেবারে নিম্নে খাদের ভিতর চলিয়া গিয়াছে। পর্ব্বত গাত্র ধরিয়া হামাগুড়ি দিয়া অতি কষ্টে

খানিকটা উপরে উঠিতে হইল; তথায় এক একটি পাদবিক্ষেপ করিবার মত স্থান পাইয়া তাহার উপর দিয়া কতকদূর আসিয়া আবার অতি কষ্টে নিম্নে নামিয়া সাবেক রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। এই স্থানটুকু অতিক্রম করিতে আমাদের বড়ই কষ্ট হইল, তদ্ভিন্ন প্রতি মুহূর্ত্তেই বিপদের আশঙ্কা হইতেছিল, ফলতঃ শরীরে যথেষ্ট সামর্থ এবং হৃদয়ে সাহস ও দৃঢ়তা না থাকিলে এরূপ দুর্গম প্রদেশ দিয়া গমন করা নিতান্ত অসম্ভব। পর্ব্বত প্রদেশবাসী ঝাঁপানিওয়ালারা পথের এ সকল দুর্গমতাকে গ্রাহ্য করে না। তাহার উপর তাহারা সকলেই বলিষ্ঠ সুতরাং আমাদের এক একজনকে পৃষ্ঠে লইয়া অবলীলাক্রমে এই সকল পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। উখীমঠ হইতে চড়াই রাস্তায় দুই তিন মাইল চলিয়া আমরা ব্রহ্মচটিতে উপনীত হইলাম, ব্রহ্মচটি হইতে দুই মাইল উতরাই নামিয়া আকাশগঙ্গা নদীর গর্ভে আসিয়া পড়িলাম। দুর্গা চটি। আকাশগঙ্গা লাফাইতে লাফাইতে চলিতেছেন, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উপলখণ্ড তাহার গতি কোনরূপে প্রতিহত করিতে পারিতেছে না। নদীর সেতুটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যাত্রীদের সুবিধার জন্য কাঠ ফেলিয়া একটি সাময়িক সেতু করা হইয়াছে। ভয়ে ভয়ে তাহার উপর দিয়া পার হওয়া গেল; পুনরায় ভীষণ চড়াই। এক দল বাঙ্গালী যাত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, দলে দুইটি পুরুষ ও আট দশজন মহিলা। সকলেই পদব্রজে যাইতেছেন। মহিলাগণ পথশ্রমে একেবারেই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এখানের ভীষণ চড়াইতে আর উঠিতে পারিতেছেন না, এক পা অতি ক্লেশে উঠিয়া আবার বসিয়া পড়িতেছেন; যাঁহারা কখনও বাড়ীর বাহির হন নাই, পদব্রজে রাস্তা হাঁটা যে কি যাঁহারা কখনও জানেন নাই, তাঁহারা কি জানি কি এক অজ্ঞাত দুর্দ্দমনীয় ব্যাকুলতার প্রেরণায় এই ভীষণ বিপদ-সঙ্কুল রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছেন,—

কি এক স্বর্গীয় আকর্ষণে জীবনের মায়া তুচ্ছ করিয়া অশেষ কষ্ট লাঞ্ছনার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া রাস্তার শত বাধা সহস্র বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতেছেন। এত শরীরের কষ্ট, কিন্তু মনের জোর কিছুতেই কমিতেছে না। সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল, সকলের মুখ হাসিতে পূর্ণ; পরস্পর পরস্পরকে আশ্বাস দিতেছেন—আর একটু পরেই বাঞ্ছিত স্থান মিলিবে। ভগবানের নিকট প্রাণ অর্পণ করিয়া সমস্ত ক্লেশ ভুলিব। তাঁহাদিগের সহিত কিছুক্ষণ কথোপকথন করিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। এক মাইল অগ্রসর হইয়া দরিয়াচটি (দৈড়া)। দরিয়াচটি অতিক্রম করিয়া একটি নর্ত্তকীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। সুললিত নৃত্য গীতের দ্বারা যাত্রীদিগের পথক্লেশ অপনোদন করিতেছেন। সুর সুললিত কিন্তু ভাষা অবোধ্য, দুএকটি কথায় বুঝিতে পারা গেল যে ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন।

এইবার ভীষণ অরণ্য; ঘননিবিষ্ট মহীরুহচয় স্ব স্ব আকাশ ভেদী মস্তক সকল উন্নত করিয়া সদর্পে দাঁড়াইয়া আছে। শাখা প্রশাখা সকল পরস্পর পরস্পরের সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। সেই অবিরলক্রম বনপ্রদেশে সূর্য্যের রশ্মি প্রবেশ লাভ করিতে না পারায় স্থানটী বাস্তবিকই ভয়ানক। তদ্ভিন্ন এখানে লোকজনের সমাগম নাই, পশু পক্ষীর সংখ্যাও বড় বেশী নয়, চারিদিক নীরব, কেবল কচিত দূরাগত বৌ-কথা-কও পাখীর শব্দে সেই নিস্তব্ধতা মাঝে মাঝে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, স্থানে স্থানে রাস্তার চিহ্নমাত্র নাই, আবার এক এক স্থানে এক একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষ ঝটিকার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ধরাশায়ী হইয়া যাত্রীদিগের পথ অবরোধ করিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এখানে রাস্তা মেরামত বা পরিষ্কার করিবার ভাল বন্দোবস্ত নাই বলিয়াই বোধ হইল। স্থানে স্থানে

ভূপতিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষসকলের শিকড়ের উপর দিয়াই রাস্তা হইয়া গিয়াছে। কত কাল যে এইরূপ অবস্থায় আছে তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য।

এইরূপ প্রায় দুই মাইল অতিক্রম করিয়া "পোথি বাসায়" উপনীত হইলাম। স্থানটী চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত একটু সামান্য সমতল ক্ষেত্র। সচরাচর চটি গুলি যেমন হয় ইহাও তেমনি; রাস্তার দুই পার্শ্বে যাত্রীদের থাকিবার ঘরের সারী; চাউল, ডাল, ঘি, আলু সমস্তই পাওয়া যায়। দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে পৌছিতে পারিলে দুগ্ধও পাওয়া যায়; তবে এ প্রদেশে মহিষ দুগ্ধই সচরাচর পাওয়া যায়, গোদুগ্ধ বড়ই দুর্লভ। নিকটেই সুশীতল ও সুস্বাদু জলের ঝরণা; রৌদ্রে বসিয়া আরামে সর্ব্বাঙ্গে তৈল মর্দ্দন করা গেল। ব্যথা নিবারণে তৈলের সমতুল ঔষধ বিরল। নিকটবর্ত্তী ঝরণায় স্নান করিলাম; এদিকে খাদ্য প্রস্তুত; আহার করিয়া পদ্মনাভের স্মরণ করা গেল। সংসারের কোলাহল এখানে পৌছিতেছে না। লোকক্ষয়কারী ভীষণ ইউরোপের যুদ্ধের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। জগৎ হইতে যেন আমরা সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি। পুঁটলি পাঁটুলি বাঁধিয়া বেলা দুইটার সময় রওনা হইলাম, পুনরায় ভীষণ বনের ভিতর দিয়া দেড় মাইল অতিক্রম করিলে একটি ভগ্ন চটি পাইলাম, তথা হইতে আবার এক মাইল পরে বণিয়া কুণ্ড। ইহা একটি অধিত্যকার উপর অবস্থিত। অনেকগুলি মহিষ চরিতেছে। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার চলিতে লাগিলাম, বরাবর চড়াই চলিতেছে, তবে তত কষ্টকর নহে। তরঙ্গায়িত বনভূমি দেখিয়া কলিকাতার ইডেন গার্ডেন ও হাওড়ার বোটানিকেল গার্ডেন মনে পড়িল। উদ্যান নির্ম্মাতৃগণ উদ্যান মধ্যে স্থানে স্থানে এই সকল তরঙ্গায়িত বনভূমির অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়াই বোধ হইল।

ক্রমে ক্রমে এক মাইল দূরবর্ত্তী "চোপতা" পৌঁছিলাম। একস্থানে কতকগুলি প্রকাণ্ড কায় সাদা হনুমান দেখিতে পাওয়া গেল। তাহারা এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষে লম্ফ দিয়া যেন আমাদিগকে জানাইতে লাগিল যে তাহারাই এ প্রদেশের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধীশ্বর। যতগুলি চটি দেখিয়া আসিয়াছি তন্মধ্যে চোপতা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থানে অবস্থিত; পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে তরঙ্গের অনুকারী পর্ব্বত শৃঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলগুলি যেন অধঃপ্রদেশে। একটির পর একটি মাথা উঁচু করিয়া উঠিয়াছে, আবার নামিয়াছে, আবার উঠিয়াছে। এইরূপে বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের লহরীলীলার অনুকরণ করিয়া কোথায় গিয়া মিশিয়াছে। সকলেই যেন অপরকে নিম্নে রাখিয়া নিজে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। সম্মুখে তুষার কিরিটি চন্দ্রশীলা শৃঙ্গ ১২০৭১ ফিট উচ্চ; ইহার উপর ৺তুঙ্গনাথ—দূরে কেদার নাথ ও চৌখাম্বা পর্ব্বত। চৌখাম্বা পর্ব্বতশেখরের গহ্বর গুলি নির্ব্বাপিত আগ্নেয় গিরির গহ্বর বলিয়াই বোধ হয়। এখনও গহ্বর গুলি সম্পূর্ণ ভরাট হইয়া যায় নাই। গহ্বরের ধারগুলি এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। চটটী অপেক্ষাকৃত বড়। সিন্ধিয়া, গোয়ালিয়র প্রভৃতি রাজন্যবর্গের ধর্ম্মশালা, সদাব্রতফণ্ডের ডিস্‌পেনসারী ও যাত্রী থাকিবার অনেকগুলি ঘর আছে। এখানে বিলক্ষণ শীত অনুভূত হইল। ইহার বাম পার্শ্ব দিয়া তুঙ্গনাথে যাইবার রাস্তা; ভীষণ চড়াই। মধ্যে মধ্যে রাস্তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; আরোহণ নিতান্তই কষ্টকর।

তিন মাইল চড়াইয়ের পর ৺তুঙ্গনাথ দেবের মন্দির, মন্দিরের নিকটে একটি কুণ্ড। ৺তুঙ্গনাথ ব্যতীত পার্ব্বতী, গণেশ, ভৈরব, ব্যাসদেব ও শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি আছে। ৺তুঙ্গনাথের মন্দিরের নিকটেই আকাশগঙ্গার উৎপত্তি। ৺কেদার নাথের ন্যায় ৺তুঙ্গনাথের ছয় মাস পূজা হয়। শীতের

ছয় মাস বন্ধ থাকে। ইহা পঞ্চ কেদারের মধ্যে একটি। আমাদিগের ভাগ্যে ৺তুঙ্গনাথ দর্শন ঘটিল না। ৺তুঙ্গনাথের দুই জন পাণ্ডার মুখে শুনিলাম রাস্তার অবস্থা বড়ই শোচনীয়। অধিকাংশ স্থলেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পুরুষেরা অতি কষ্টে যাইতে পারেন; কিন্তু স্ত্রীলোকদের পক্ষে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। বিশেষতঃ আমাদের সঙ্গে অশীতিপরবৃদ্ধা। পাণ্ডা দুই জন আমাদিগকে নিরস্ত হইবারই পরামর্শ দিলেন। মনে বড়ই কষ্ট হইল; এতদূর আসিয়া ৺তুঙ্গনাথের দর্শন মিলিল না। যাহা হউক পাণ্ডা-দিগের নিকট প্রসাদ গ্রহণ করিয়া সে আশা ত্যাগ করিলাম। কিঞ্চিৎ চড়াইয়ের পর উতরাই। যেখানে উতরাই আরম্ভ হইল ঠিক সেইখানে একটি ছোট মন্দিরের মধ্যে ৺তুঙ্গনাথের একটী মূর্ত্তি। যাঁহারা শৃঙ্গদেশে উঠিতে অক্ষম হন তাঁহারা এই মন্দিরস্থিত দেবমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া মনের আক্ষেপ মিটাইয়া থাকেন।

আমাদিগের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। ভগবানকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। ভীষণ উতরাই, গড় গড় নামিয়া আসিতে লাগিলাম, যেন এই পড়ি এই পড়ি। দেড় মাইল উতরাইয়ের পর ভুলকণা চটি। প্রায় দুই মাইল পরে ভীমগোড়া চটি। চোপতা হইতে উঠিয়া পর্ব্বত উলঙ্ঘন করিয়া তুঙ্গনাথের রাস্তা আবার এইখানে বদরিনাথের রাস্তায় মিশিয়াছে। সন্ধ্যা আগতপ্রায়, আর অগ্রসর হওয়া সমীচীন নহে; জগৎ নিস্তব্ধ হইয়া আসিতেছে নির্জ্জন বনপ্রদেশে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দ শোনা যাইতেছে না: সেই বাতাসও বুঝি থামিয়া আসিতেছে; মহীরুহ সকল নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া বুঝি বা বিশ্বেশ্বরের ধ্যান করিতেছেন। একটি ঘরে আশ্রয় লইলাম; এখানে বড়ই শীত। চটিওয়ালা ঘরে আগুন করিয়া রাখিয়াছে। দুইটী কুণ্ড

জ্বলিতেছে। মোটা মোটা বৃক্ষ শাখা আগুনে দেওয়া হইয়াছে। তথাপি এক একবার বাতাস আসিয়া সমস্ত শরীর কাঁপাইয়া দিতেছে। ভায়া আমার চটিওয়ালার নিকট হইতে উত্তম ঘি, ময়দা সংগ্রহ করিলেন। আলুও কিছু পাইলেন। নিজেই আগুন ধরাইলেন; কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা করিলেন না। লুচি, আলুর তরকারী প্রস্তুত হইল। পরিতৃপ্তি সহকারে উদরপূর্ত্তি করা গেল। দুরন্ত শীতে বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। আমাদিগের যে সকল শীতবস্ত্র সম্বল ছিল, তাহাতে কোনরূপে শীতের প্রকোপ হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই দুরূহ হইয়া উঠিল। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কোনরূপে রাত্রি অতিবাহিত করিলাম।

৫ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার। অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করা গেল; যথা-রীতি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া যাত্রা করিলাম। পূর্ব্বদিনের ন্যায় ভীষণ অরণ্যের ভিতর দিয়া রাস্তা। এক মাইল চড়াইয়ের পর দুই মাইল উতরাই, তাহার পর জঙ্গল-চটি বা পাঙ্গর বাসা। ভীষণ অরণ্যের মধ্যে। কিন্তু সারিবদ্ধ অনেকগুলি ঘর আছে। মেষপালকদিগেরও থাকিবার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে। বড় বড় আটচালার মধ্যে দলে দলে মেষ রহিয়াছে। এখানে বোধ হয় দুগ্ধ অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। কারণ চটিতে প্রবেশ করিবামাত্র "বাবু দুধ চাই, বাবু দুধ চাই" বলিয়া কয়েক জন আমাদিগের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু এত সকালে দুধের কোন আবশ্যকতা নাই জানিয়া তাহারা ক্ষুব্ধ-চিত্তে চলিয়া গেল। সামান্য মাত্র বিশ্রাম করিয়া পুনরায় বাহির হইলাম। এখন বরাবর উতরাই; প্রায় চার মাইল উতরাইয়ের পরে রুদ্রগঙ্গা নদী। নদীতীরে মণ্ডল চটি। অনেকটা সমতল ভূমি। চটিটিও অপেক্ষাকৃত বড়; খাদ্য দ্রব্যের অনেক গুলি দোকান আছে। এখান হইতে একটি রাস্তা বরাবর রুদ্রনাথের

দিকে চলিয়া গিয়াছে। রুদ্রনাথ পঞ্চ-কেদারের মধ্যে একতম। এখান হইতে রুদ্রনাথের মন্দির প্রায় ১৫ মাইল। মধ্যে অনুসূয়া দেবীর মন্দির আছে। মণ্ডলচটির দুই মাইল দূরে রাস্তা বড় কদর্য্য; চড়াই অত্যন্ত বেশী; খুব কম লোক ঐ রাস্তা দিয়া যাতায়াত করে। এই রাস্তাটি রুদ্রনাথ হইয়া চামোলী হইতে চার মাইল দূরে ছিন্‌কা চটিতে মিশিয়াছে।

মণ্ডলচটি ত্যাগ করিয়া পদব্রজে রুদ্রগঙ্গা পার হইলাম। সেতুটী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। অপর পারে নদীর ধার দিয়া সুগম রাস্তা পড়িয়া রহিয়াছে। নদীর পাড়ের উপর দিয়া রাস্তাটি নির্ম্মিত। রাস্তাটি পরিষ্কার; কলিকাতার ষ্ট্র্যাণ্ড রোডের কথা মনে পড়িল। এইরূপে প্রায় দুই মাইল অতিক্রম করিয়া বৈরগণা চটি; মধ্যে বালাসুত নদী পার হইতে হয়। কিঞ্চিৎ চড়াইয়ের পর আরামচটি। পরে উতরাই—এক মাইল হইবে। বীর বা বালখিল নদীর তীরে আসিয়া পৌছিলাম। সেতুটী ভাঙ্গা, অদৃষ্টে কেবল ভাঙ্গা সেতুই মিলিতেছে। নদীর এবং তীরস্থিত দুই পার্শ্বের পাহাড়ের অবস্থা দেখিয়া বড়ই ভয় হইল; কিরূপে পার হওয়া যাইবে। নীচে নদী বহিয়া যাইতেছে, দুই পার্শ্বে প্রাচীরের ন্যায় পাহাড়। ঝাঁপানী কুলীরাই পথের কাণ্ডারী, তাহাদের সাহায্যে অতি কষ্টে একে একে নদী পার হওয়া গেল। নিকটেই সেটুনা চটি। পুঁটলী পাটলী ফেলিয়া এইখানেই মধ্যাহ্ন ভোজনের বন্দোবস্ত করা গেল। চটি ওয়ালাটি বেশ সজ্জন। তাহার অবস্থাও ভাল। নিজের চাষ আছে। চাষে গম জন্মায় এবং নিচে নদী স্রোতে গম পিসিবার জাঁতা আছে। বাহিরের কোন খবর রাখেন না। স্ত্রী পুত্র লইয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে পর্ব্বত মধ্যে কাল যাপন করিতেছেন। একটি পুত্র আসিয়া সূচ সুতার অভাব জানাইল। এদেশে সূচ সুতা বড় পাওয়া যায় না, তাই ৺কেদারনাথ

ও ৺বদরীনাথ দর্শনেচ্ছু অনেকেই সঙ্গে করিয়া সূচ, সুতা লইয়া যান। পাহাড়ী লোকেরা প্রায় সূচ সুতা চাহিতে আসে। মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপনান্তে কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর আন্দাজ বেলা দুই ঘটিকার সময় পুনরায় যাত্রা করিলাম। প্রায় দেড় মাইল অতিক্রম করিয়া "গোপেশ্বর" ; মধ্যে এক স্থানে রাস্তার চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পাহাড় ধসিয়া গিয়াছে, রাস্তা কোথায় থাকিবে। গোপেশ্বর একটি সুন্দর গ্রাম। এখানে গোপেশ্বর দেবের একটি পুরাতন মন্দির আছে। মন্দিরটি প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত, প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে সারিবদ্ধ ঘর আছে। তাহাতে যাত্রীরা বিশ্রাম করিতে পারেন। প্রাঙ্গণের এক কোণে লৌহ নির্ম্মিত একটি প্রকাণ্ড ত্রিশূল আছে। তাহাতে কত কি লেখা রহিয়াছে। কিন্তু অক্ষরগুলি ক্রমে ক্রমে মুছিয়া যাইতেছে। প্রাঙ্গণের বাহিরে একটি দ্বিতল ঘরে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবী। নিকটে পাণ্ডা মহারাজের গদী। গোপেশ্বর দেবের পূজারীও রাওল নামে অভিহিত। পূর্ব্বে ইনি কেদার নাথের রাওলের অধীন ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার অধীনতা ত্যাগ করিয়াছেন। পূজার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য কতিপয় গ্রামের রাজস্ব বরাদ্দ আছে। গোপেশ্বর চোপতা হইতে ১৩ মাইল দূরে এবং অলকনন্দার একটি শাখা বালাসুত নদীর বামতীরে অবস্থিত। এখানে একটি বালিকা বিদ্যালয় আছে। দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া ও গোপেশ্বর দেবকে যথারীতি পূজা করিয়া অগ্রসর হওয়া গেল। রাওল সাহেব বেশ সজ্জন, তিনি হাসিমুখে আমাদিগকে নানারূপ কথোপকথনে আপ্যায়িত করিলেন। গোপেশ্বর ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে নামিতে হইল। প্রায় তিন মাইল অবতরণের পর আমরা অলকনন্দা পাইলাম। অলকনন্দাকে আমরা রুদ্রপ্রয়াগে ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম।

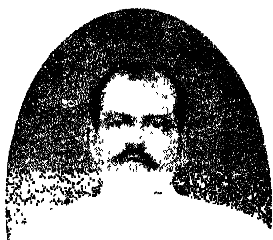
অলকনন্দার অপর পারে, লালসাঙ্গা বা চামৌলী। ইহা একটি ক্ষুদ্র সহর; গাড়োয়াল জেলার একটি সাবডিভিসন্; এখানে একজন ডেপুটী কলেক্টর থাকেন। তাঁহার আদালত পাহাড়ের উপর। নিম্নে পূর্ত্ত বিভাগের ইন্স্পেকসন্ বাঙ্গলা। অলকনন্দার দক্ষিণ তীরে একটি বাজার আছে। পূর্ব্বে এই বাজারটী বামতীরে ছিল; ১৮৯৪ সালে গোহনার ভীষণ জলস্রোতে সমস্ত ভাসিয়া গিয়াছে। অলকনন্দার পুরাতন পুলটিও এই সময়ে ভাসিয়া যায় এবং তাহার স্থানে ২৩৩ ফিট লম্বা একটি সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফ্ অফিস, হাঁসপাতাল, যাত্রীদিগের থাকিবার স্থান, দোকান প্রভৃতি সকলই আছে। যাঁহারা এখানে থাকিতে চাহেন তাঁহাদিগকে উক্ত পুলটী পার হইয়া যাইতে হয়; এপারে থাকিবার কোন ঘর বাড়ী নাই। কেবল নদীগর্ভ হইতে উত্থিত প্রাচীরের ন্যায় খাড়া পাহাড় গম্ভীর ভাবে দাঁড়াইয়া নদীর প্রচণ্ড বেগ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। নদীর কিনারার রাস্তাটী অত্যন্ত সুন্দর। নদী গর্ভ হইতে পাথর দিয়া বাধান। রাস্তাটীর এক পার্শ্বে নদী এবং অপর পার্শ্বে পর্ব্বত। আমাদিগের লালসাঙ্গা যাইবার কোন আবশ্যক ছিল না। কিন্তু হিসাব করিয়া দেখা গেল আমাদের সম্বল বড়ই কমিয়া গিয়াছে। টাকার দরকার সুতরাং টেলিগ্রাফ্ অফিসের সাহায্য লইতে হইল। পুল পার হইয়া টেলিগ্রাফ্ অফিসে যাইলাম। রণেশ ভায়াকে টাকার জন্য তার করা হইল।

ভাই রণেশ, * এখন তুমি অমরধামে, কিন্তু প্রাণের ভিতর তুমি যে দুর্ব্বিসহ শোকের অনল জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছ সে অনলে তোমার দাদার

---

*৺রণেশচন্দ্র দাস L.E., A.M.I.C.E., M.R.San.I., M.R.S.A., M.E., &c. এ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়র, বিহার এবং উড়িষ্যা। জন্ম [illegible] মে ১৮৭৪, মৃত্যু ১২ই আগষ্ট [illegible]।

হৃদয়খানা পুড়িয়া একেবারে খাক হইয়া যাইতেছে। তোমার স্মৃতি সুপ্তশোক জাগাইয়া দিতেছে। তোমার সেই চিরসুন্দর মুখখানির কথা, বালকের মত সেই সরলতার কথা, এখনও মনে পড়িলে হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে লুক্কায়িত শোক সহসা যে সন্ধুক্ষিত হইয়া উঠে। ভাই যখন যেখানে গিয়াছি তোমারই উৎসাহে, তোমারই পরামর্শে গিয়াছি। তুমি নিজে কোথাও যাও নাই কিন্তু আমাকে ভারতের তীর্থে তীর্থে বেড়াইবার জন্য তুমি কতই উৎসাহ দিয়াছ, কোথায় কি দেখিব, কোথায় কি দেখিবার আছে, তাহা তুমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছ, বারম্বার কত অনুরোধ করিয়াছ। ভ্রমণে বাহির হইয়া যাহাতে কখন কোনরূপ অর্থকষ্টে না পড়ি তজ্জন্য অনবরত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি রাখিয়াছ, কিন্তু এখন তুমি কোথায়! তুমি সমস্ত জীবন প্রবাসে থাকিয়া কত কষ্টভোগ করিয়াছ অথচ দাদাকে সর্ব্বদা সুখে রাখা, হৃষ্ট রাখা তোমার জীবনের ব্রত ছিল, আজ তোমার সেই দাদা তোমাকে হারাইয়া শত বৃশ্চিকের দংশনের জ্বালায় অস্থির, তাহাতে কি তোমার কোমল হৃদয়ে ব্যথা লাগিতেছে না? তোমার প্রাণবায়ু বাহির হইবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তেও যে তুমি তোমার দাদাকে ভুলিতে পার নাই তাহার নিদর্শন তোমার জীবনের শেষোচ্চারিত কয়েকটী কথায় দিয়া গিয়াছ, তাই এখনও ভাবিতে পারি না যে তুমি তোমার সেই শোকার্ত্ত দাদাকে চিরতরে ভুলিতে পারিয়াছ। কিন্তু ভাই, আবার কি কখনও তোমার মুখে অপর কোন জগতে সেই চিরপরিচিত, মধুর "দাদা" সম্বোধন শুনিতে পাইব?



স্বর্গীয় রণেশচন্দ্র দাস।

(২)

জোশীমঠ।

লালসাঙ্গা	হইতে	মঠ—২	মাইল।	লালসাঙ্গা	হইতে	দেওয়রা—১৬	মাইল
,,	,,	ছিনকা—৩	,,	,,	,,	পাতালগঙ্গা—১৭	,,
,,	,,	সিয়াহার—৬	,,	,,	,,	গুলাবকোটী—১৯	,,
,,	,,	হাট—৭	,,	,,	,,	কুমার—২২	,,
,,	,,	পিপলকোটী—১০	,,	,,	,,	খনোটি—২৪॥	,,
,,	,,	গরুড় গঙ্গা—১৩	,,	,,	,,	সিঙ্গধার—২৭	,,
,,	,,	টাঙ্গলি—১৫	,,	,,	,,	জোশীমঠ—২৮	,,

অলকনন্দার ধারে ধারে চলিতে লাগিলাম। দুই মাইল পরে মঠচটি; চটিটি বড়। বৃষ্টি আসিতেছে দেখিয়া এই চটিতে আশ্রয় লইতে মনস্থ করিলাম। চটিতে অনেকগুলি ঘর থাকিলেও যাত্রীর সংখ্যা এত অধিক যে কোন ঘরে স্থান পাওয়া গেল না। অগত্যা এ চটি ত্যাগ করিতে হইল। এখানে কতিপয় বন্ধুর সহিত দেখা হইল। তাঁহারা আমাদের আসিবার পূর্ব্বেই এখানে আসিয়া বাসা লইয়াছেন। তাঁহাদের বাসাতেই আমাদিগের আশ্রয় লইবার জন্য অনুরোধ করিলেও তাঁহাদিগকে অনর্থক কেন কষ্ট দিব ভাবিয়া এক মাইল দূরস্থিত ছিনকা চটিতে যাইয়া পুঁটলী-পাঁটলা নামাইলাম। ইহা হরিদ্বার হইতে ১৩৯ মাইল। একটি দ্বিতল গৃহে আশ্রয় লইলাম। এখানে একটু জলকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। নদী অনেক নিম্নে সেখান হইতে জল আনা একেবারে অসম্ভব। চটি হইতে একটু দূরে একটি ছোট ঝরণা আছে, তাহা হইতে অতি সূক্ষ্ম ধারায় জল পড়িতেছে। এক কলসী

৭

জল লইতে অনেক সময় আবশ্যক ; তা'ছাড়া সকল সময়েই কেহ না কেহ কলসী হস্তে অপেক্ষা করিতেছে। ভগবানের ইচ্ছায় জলের জন্য আমাদের বিশেষ কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই। যথাসময়ে আহার প্রস্তুত হইল। পরিপাটিরূপে ভোজন করিয়া শয়ন করিলাম। আমাদের ঘরের পাশেই একটি বোম্বাই প্রদেশবাসী ভদ্র লোক আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি সপরিবারে ৺বদরীনাথ দর্শনে চলিয়াছেন, সঙ্গে মাতা, স্ত্রী, ও একটি শিশু। তাঁহার সঙ্গে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নানারূপ কথা-বার্ত্তায় আনন্দে কাটিয়া গেল।

৬ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার। এখনও প্রভাত হয় নাই, সূর্য্য উঠিবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। চন্দ্রদেব এখনও তাঁহার রজত কিরণে চারিদিক আলোকিত করিতেছেন। রাস্তায় মনুষ্য চলাচলের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পূর্ব্ববর্ত্তী চটির যাত্রীরা জ্যোৎস্নার আলোকে রাত্রি থাকিতে থাকিতেই পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরাও তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। যত শীঘ্র সম্ভব প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া লইলাম। তখনও অরুণালোকের দেখা নাই। চাঁদের আলোকেই বাহির হইয়া পড়িলাম। রাস্তা একই রকমের, এক পার্শ্বে আকাশস্পর্শী পাহাড় ও অপর পার্শ্বে অলকনন্দা। এক মাইল পথ অতিক্রম করিলে সম্মুখে বিরহী গঙ্গা*। এই বিরহী গঙ্গার তীরে সতীবিরহে আকুল হইয়া শিব তপস্যা করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ সালে ২৫শে আগষ্ট তারিখে ইহারই জলোচ্ছ্বাসে তীরস্থিত পাহাড়, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, সমস্তই ভাসিয়া একেবারে ওলট

* তত উত্তর দিগ্‌ভাগে নদী পরমপাবনী।
হ্রীহিকানাম্না বিখ্যাতা সর্ব্ব পাপহরা মতা॥
ততো বৈ বিরহবতী নদী পাপপ্রমোচনী।
বিরহেন পুরা তত্র সন্তাপ্তপ্তঃ শিবেন হি॥

পাল্‌টে হইয়া গিয়াছে। ইহার পরাক্রমের চিহ্ন এখনও স্থানে স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাহাড় ধস খাইয়া গোহনা নামক গ্রামের নিকট নদীস্রোত একবারে বন্ধ হইয়া যায়। নদীগর্ভে এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত একটা বিরাট বাঁধের উৎপত্তি হয়। বাঁধটি তলদেশে ১১০০০ ফিট প্রশস্ত—শীর্ষদেশে ২০০০ ফিট প্রশস্ত এবং উচ্চে ৯০০ ফিট। নদীর জল এইরূপে অবরুদ্ধ হইয়া একটি হ্রদে পরিণত হইল। সকলেই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, ক্রমে ক্রমে জল বাড়িয়া বাঁধ উপচাইয়া অলকনন্দা ও গঙ্গার উভয় পার্শ্বস্থ স্থান সমূহের বিশেষ ক্ষতি করিবে। প্রত্যহ কত জল বাড়িতে লাগিল দেখিবার জন্য তথায় একজন এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার নিযুক্ত হইলেন, এবং ভাবী বন্যার বেগ পরিদর্শন করিবার জন্য গোহনা, চামৌলি, নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, শ্রীনগর, বা, ব্যাসঘাট, হৃষীকেশ ও হরিদ্বারে এক একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন। অলকনন্দার উভয় তীর হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত যে সকল গ্রাম ছিল তাহাদের লোকগুলিকে স্থানান্তরিত করা হইল। কবে সেই ভীষণ বন্যা আসিবে সকলেই তাহার প্রতীক্ষায় রহিলেন। পরিশেষে ২২শে আগষ্ট তারিখে এসিষ্ট্যাণ্ট ইঞ্জিনিয়ার ক্রুকশ্যাঙ্ক সাহেব সংবাদ দিলেন আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ভীষণ বন্যা আসিবে। ২৫শে আগষ্ট প্রাতে বাঁধ উপচাইল, এবং রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভীষণ জলস্রোত ভীষণ গর্জ্জনে পর্ব্বত কম্পিত করিয়া ধাবিত হইল। সম্মুখে যাহা পাইল তাহাই ভাসাইয়া লইয়া গেল। সে ভীষণ বেগ কেহই সহ্য করিতে পারিল না। অলকনন্দার উভয় তীরবর্ত্তী স্থানগুলি বিভিন্ন আকার ধারণ করিল। লোকালয়ের চিহ্ন সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া গেল ; গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী শ্রীনগর একেবারে অদৃশ্য হইল। চামোলির পুরাতন

বাজারটি ধরণীপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইল। ২৬শে আগষ্ট প্রাতে দেখা গেল যে, বাঁধের মধ্যে ৩৯০ ফিট জল নামিয়া গিয়াছে এবং ১০,০০০,০০০,০০০, ঘনফিট জল বাহির হইয়া গিয়াছে।

বিরহীগঙ্গার এখন আর সে তেজ নাই। ক্ষীণ কলেবরে ধীরে ধীরে অলকনন্দায় আসিয়া মিশিয়াছেন। বিরহীগঙ্গার সঙ্গমস্থল ছাড়িয়া অগ্রসর হইয়া একটি গিরিসঙ্কটের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। পর্ব্বতগাত্রে গাছের লেশ মাত্র নাই। গিরিরাজের সেই কঠিন পাষাণমূর্ত্তি পথিকদের মনে ভীতির উদ্রেক করিতেছে। অতি নিম্নে অলকনন্দা সেই সুকঠিন পাষাণের উপর ভীম পরাক্রমে আঘাত করিয়া প্রতিহত হইতেছেন। গিরিরাজ যেন উপেক্ষার দৃষ্টিতে অলকনন্দার এই নিষ্ফল আস্ফালন দেখিয়া অটল হইয়াই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। স্থানটি অতীব ভীষণ। ভগবানকে স্মরণ করিয়া ধীরে ধীরে দুই মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সিয়াহার চটিতে পৌছিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। চটিটি বড়। বহুসংখ্যক নরনারীতে পূর্ণ। কি এক মন্ত্রবলে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সকলে সমাগত হইয়াছেন। সকলের মুখ আনন্দে পুলকিত। পথকষ্টের চিহ্ন মাত্র নাই। বাঙ্গালী, মাদ্রাজী, মারহাট্টী, রাজপুত, হিন্দুস্থানী সকলে এক মায়ের ছেলে—এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত। কাহারও কোন সঙ্কোচ নাই, অকপট হৃদয়ে পরস্পর পরস্পরের মনের ভাব ব্যক্ত করিতেছেন। ভাই যেন ভাইকে চিনিয়াছে। কি মধুর সম্মিলন। সকলের মুখে "জয় বদরী বিশালা কি জয়।"

এখানে ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। এক মাইল পরে হাটচটি। এ চটিটিও বড়, যাত্রীতে পরিপূর্ণ; কেদারনাথের রাস্তায় কোন চটিতে এত অধিক সংখ্যক যাত্রী দেখিতে পাই নাই। কেদারনাথ

অপেক্ষা বদরীনাথের যাত্রী অধিকতর বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। হাটচটি পশ্চাতে রাখিয়া চলিতে লাগিলাম, ক্রমে একটি লৌহ সেতুর নিকটে আসিয়া পৌঁছিলাম, সেতুটি আশী ফিট লম্বা। সেতু দ্বারা অলকনন্দা পার হইলাম। সেতুর উপর হইতে নিম্নে চাহিলে মাথা একেবারে ঘুরিয়া যায়। পাতাল দিয়া অলকনন্দা বেগে ছুটিতেছেন। পর্ব্বতের মধ্যে তিলার্দ্ধের জন্য যেন তিনি থাকিতে চাহিতেছেন না। কোথাও কিছু বাধা পাইলে দ্বিগুণতর বেগে আবার ছুটিতেছেন। সেতু পার হইয়া ক্ষণেক বিশ্রাম করিলাম। নিম্নে অলকনন্দার ভীষণ প্রবাহ। উপরে ভীষণ চড়াই। উপরদিকে চাহিয়া দেখি দলে দলে যাত্রিগণ পিপীলিকা সারির ন্যায় চলিয়াছে—একদল আসিতেছে আর একদল যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে সহস্র কণ্ঠে 'জয় বদরীবিশালা কি জয়' শব্দে গিরিচূড়া প্রতিধ্বনিত হইতেছে। অলকনন্দা বুঝি আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া যাত্রিগণের কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া 'জয় বদরী বিশালা কি জয়' শব্দে চতুর্দ্দিক মুখরিত করিতেছেন। অথবা দেবাদিদেবের দর্শন পাইয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া পাপীদিগকে শান্তিনিকেতনের পথের সন্ধান বলিয়া দিতেছেন।

চড়াইতে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। প্রতি পদবিক্ষেপে 'জয় বদরী বিশালা কি জয়' শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। হঠাৎ একি! পথের পার্শ্বে একটি স্ত্রীলোক পড়িয়া রহিয়াছে, নিকটেই একটি কাণ্ডি, অদূরে কাণ্ডি-ওয়ালা। ভীষণ চড়াইতে উঠিতে গিয়া হঠাৎ কাণ্ডিওয়ালার পদস্খলন হইয়াছে। আরোহী সহিত কাণ্ডিটি ফেলিয়া দিয়াছে। কাণ্ডিটি পর্ব্বতের দিকে পড়িয়াছিল তাই রক্ষা—নদীর দিকে পড়িলে যে কি হইত তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। কোথায় যাইয়া অনন্তে মিশিয়া যাইত। রমণী মাথায় বিষম আঘাত পাইয়াছেন। সম্পূর্ণ অজ্ঞান। মাথায় জল দিবার

ব্যবস্থা হইল। জলের একটি নাম জীবন। জল দিতে দিতে স্পন্দন শক্তি ফিরিয়া আসিল। ক্রমে চক্ষু চাহিলেন। লজ্জায় জড়সড় হইয়া পড়িলেন। কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া পদব্রজে অগ্রসর হইবার প্রস্তাব করিলেন, কাণ্ডিতে উঠিতে চাহিলেন না। তাঁহার সঙ্গীদিগকে কিছুকাল বিশ্রাম করিতে বলিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম।

তিন মাইল চড়াইয়ের পর পীপলকোটি। চটিতে প্রবেশ করিলে রাস্তার দুই পার্শ্বে সারীবদ্ধ দোকান। পীপলকোটী একটি বড় গ্রাম বলিয়া বোধ হইল। কয়েকটি ছোট ছোট মন্দির ও অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। একটি মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ আছেন। লিঙ্গটী শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রবাদ। দোকানে চামর বিক্রীত হইতেছে। এ অঞ্চলে নোটের প্রচলন নাই। যাহারা নোট লইয়া যান তাহারা এখানে নোট ভাঙ্গাইয়া লইতে পারেন। অনেকগুলি বড় বড় মহাজনি দোকান আছে। অবশ্য বাটা লাগে। এক শত টাকার নোট ভাঙ্গাইতে অন্ততঃ এক টাকা লাগে। পীপলকোটীতে পোষ্ট অফিস, পুলিশ, সরকারী বাঙলা, ও যাত্রীদিগের থাকিবার বিস্তর ঘর আছে।

দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি কতক কতক দেখিয়া অগ্রসর হইলাম। কতক চড়াই কতক উতরাই করিয়া প্রায় তিন মাইল পরে গরুড়-গঙ্গার * তীরে

* ততো গরুড়গঙ্গায়াং গঙ্গায়া দক্ষিণতটে।
স্নাত্বা দেবং সমাভ্যর্চ্চ্য পক্ষীশং বিষ্ণুরূপিনম্॥
পঞ্চকোটিসহস্রানাং বর্ষাণাং বসতে চিরম্।
বিষ্ণুলোকে যোগীগম্যো ততো যোগিষু জায়তে॥
ন তত্র সর্পজ ভয়ং বিদ্যতে ন তথা বিষাৎ।
বিষগ্রস্তোঽপি যো মর্ত্ত্যো জলে স্পৃষ্টং পিবেত্তু বৈ॥
ন তত্র সর্পবিষজং ভয়ং ভবতি কর্হিচিৎ।

কেদারখণ্ড।

উপনীত হইলাম। হরিদ্বার হইতে সোজা পথে ১৪৯ মাইল। এপারে কেবল সদাব্রত ধর্ম্মশালা। একটি কাঠের পুল দিয়া নদী পার হইলাম। নদী পার হইলে চটি মিলিল। অনেকগুলি বড় বড় ঘর থাকা সত্ত্বেও সকল যাত্রীর স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। অনেকে গাছতলায়, খোলা জায়গায় আশ্রয় লইয়াছে। ভগবানের কৃপায় এত ভিড়ের মধ্যেও আমরা একটি ঘর পাইলাম। আমরা ঘরে প্রবেশ করিয়া কতকগুলি যাত্রীকে সেই ঘরে আসিতে বলিলাম। পুঁটলি পাঁটলা ফেলিয়া স্নানার্থ গঙ্গাগর্ভে অবতরণ করিলাম। একটি সুন্দর পাকাঘাট জল পর্য্যন্ত গিয়াছে। ঘাটে লোকে লোকারণ্য—ন স্থানং তিলধারণং, একদল উঠিতেছে, একদল নামিতেছে। নদীগর্ভে কেহ মন্ত্র পড়িতেছে, কেহ জলে ডুব দিতেছে, কেহ হামাগুড়ি দিয়া এদিক ওদিক যাইতেছে—নদীতে হাঁটু জল অপেক্ষা বেশী জল নাই। কিন্তু জলের বেগ বড়ই প্রখর, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা একটু শক্তিসাপেক্ষ। অনেকেই নদীগর্ভ হইতে উপলখণ্ড কুড়াইতেছেন। গরুড়গঙ্গার উপলখণ্ড সর্পভয়নিবারক। ঘাটের উপরেই গরুড়জীর মন্দির। তাঁহাকে থালা ও পেঁড়াদির দ্বারা অর্চ্চনা করিতে হয়।

এখানে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামান্তে আন্দাজ দুইটার সময় বাহির হইয়া পড়িলাম। প্রথমেই চড়াই। প্রকাণ্ডকায় অভ্রভেদী চিরবৃক্ষের সারির মধ্য দিয়া আমরা যাইতে লাগিলাম। এই চিরবৃক্ষের কাঠ দিয়া এখানকার সেতুগুলি নির্ম্মিত হয়। কিন্তু কাঠগুলি অধিক দিন স্থায়ী নহে। শীঘ্রই পচিয়া যায়। এইজন্য সেতুগুলি পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ক্রমে টাঙ্গনি ও দিওয়ার চটি অতিক্রম করিলাম। আকাশে মেঘ দেখা দিল। দূর হইতে মেঘগর্জ্জনের অস্ফুট শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। বাতাসের বেগও বাড়িতে লাগিল। ১৫৩নং মাইল ষ্টোনের

নিকট পৌঁছিয়া দেখা গেল যে, রাস্তার চিহ্ন একবারে লুপ্ত হইয়াছে। আকাশস্পর্শী পর্ব্বতের তলদেশ দিয়া খরস্রোতা স্রোতস্বিনী তীরবেগে পাগলের মত ছুটিতেছে। বাতাসের বেগে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড পর্ব্বতের গাত্র হইতে মহাবেগে গড়াইতে গড়াইতে নদীগর্ভে পড়িতেছে। প্রকৃতির এই সংহারমূর্ত্তি দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। আশ্রয়ের স্থান নাই—চটি হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। ভগবানকে স্মরণ করিয়া রাস্তার উপর বসিয়া পড়িলাম। ৺বদরীনাথ হইতে প্রত্যাগত একদল যাত্রীর সহিত দেখা হইল। তাহারা এই ঝড়ের সময় বড়ই বিপদে পড়িয়াছিলেন। একজন মস্তকে অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছেন। তাহারা আমাদিগকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু এতদূর আসিয়া ফিরিতে কোনরূপে মন সরিল না। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল এই স্থানে অপেক্ষা করিলাম। প্রকৃতির লীলা বোঝা ভার— কখন মধুর হাস্যে স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সকলের হৃদয়ে শান্তিবারি ঢালিয়া দেন, আবার পরক্ষণে ভীষণ ভ্রুকুটি সহকারে অট্টহাস্যে নির্ভীকের অন্তঃকরণেও ভীষণ ভীতির উদ্রেক করেন। মা যেমন মাঝে মাঝে ভ্রুকুটী দেখাইয়া পরক্ষণেই শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করেন, মাতৃরূপিণী প্রকৃতিও সেইরূপ কখন উগ্র কখন শান্তমূর্ত্তিতে আমাদিগকে কখন ভীত কখন প্রফুল্ল করেন।

বায়ুর বেগ কিছু প্রশমিত হইল। রাস্তার সহায় ঝাঁপানিকুলিদের সাহায্যে নিম্নে অতিনিম্নে নদীগর্ভে অবতরণ করিলাম। নদীগর্ভস্থিত প্রস্তরখণ্ডে পদবিক্ষেপ করিয়া খানিকদূর অগ্রসর হইয়া আবার উঠিতে আরম্ভ করিলাম। অতিকষ্টে এইরূপে কিছুদূর যাইলে প্রকৃত রাস্তা

মিলিল। পার্ব্বত্য কুলিদের সাহায্য ব্যতীত এরূপ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার সম্ভাবনা নাই।

ক্রমে পাতাল-গঙ্গায় আসিয়া পৌঁছিলাম। নদীর উপরেই এই নামে একটি চটি। পাতাল-গঙ্গাকে গণেশ-গঙ্গাও * বলে। এখনও বেলা আছে, আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। হরিদ্বার হইতে সোজাপথে ১৫৫ মাইল দূরে গুলাবকোটী চটি পাইলাম। বেলা ছয়টা দশ মিনিট। অদ্য এইখানে বিশ্রাম। এখানে একটিও যাত্রী নাই। ঝড়ের ভয়ে বোধ হয় যাত্রীরা কেহই পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী চটি ছাড়ে নাই। ক্রমে অন্ধকার আসিয়া পড়িল। ঘন অন্ধকারে পর্ব্বত, পাহাড় নদী সমস্তই ঢাকিয়া ফেলিল। দুই একটী করিয়া যাত্রী আসিতে লাগিল। সর্ব্বশুদ্ধ দশ বারটির অধিক হইল না। তাহারা সকলেই অযোধ্যা ও আগরা প্রদেশবাসী। চটির ঘরগুলি সব খালি পড়িয়া রহিল। রাত্রিতে বিলক্ষণ শীত বোধ হইয়াছিল। কম্বল মুড়ি দিতে হইয়াছিল। কিছু উপরে পর্ব্বতের গায়ে একটী সুন্দর ডাকবাঙ্গালা। সরকারী কর্ম্মচারিরা পরিদর্শন করিবার সময় ইহাতে অবস্থান করেন। অন্যান্য পথিকেরাও থাকিতে পারেন তবে পূর্ব্বে অনুমতি লইতে হয়। ডাকবাঙ্গালা হইতে চারিদিকের দৃশ্য বড়ই মনোরম।

৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার। অতি প্রত্যুষে ভগবানকে স্মরণ করিয়া যাত্রা করিলাম। তিন মাইলের পর কুমার বা হিলাংচটি। যাত্রিদের থাকিবার স্থান যথেষ্ট, একটি পোষ্ট আফিসও আছে। এই চটির প্রায় সিকি মাইল নিম্নে কল্পেশ্বরগঙ্গা—কর্ম্মনাশা ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থল। নিকটেই নিবিড় দেবদারুবনমধ্যে ৺ কল্পেশ্বর মহাদেব। ইনি পঞ্চ

* ততো গণেশনদ্যাং বৈ স্নাত্বা পাপক্ষয়ো ভবেৎ।

কেদারের মধ্যে একটি। আড়াই মাইল তিন মাইল পরে অর্থাৎ ১৬০ ও ১৬১ মাইল ষ্টোনের মধ্যে খনোটিচটি। এখান হইতে একটি রাস্তা ধ্যান-বদ্রীর দিকে গিয়াছে। ধ্যানবদ্রী পঞ্চবদ্রীর মধ্যে একটি। খনোটি চটি হইতে দুই মাইল পরে ঝারকুলা চটি, এক মাইল পরে রাস্তার নীচে অনীমঠ, অনীমঠে বৃদ্ধ বদ্রীর মন্দির। ইনিও পঞ্চ বদ্রীর মধ্যে একটি। অর্দ্ধ মাইল পরে সিঙ্গাধার চটি।

একটু যাইয়া রাস্তাটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। একটি রাস্তা বাম দিকে পাহাড়ের নীচে দিয়া বিষ্ণুপ্রয়াগের দিকে গিয়াছে। অন্যটি দক্ষিণ দিকে প্রায় অর্দ্ধ মাইল যাইয়া জোশীমঠে পৌঁছিয়াছে। আমরা আপাততঃ বিষ্ণুপ্রয়াগের রাস্তা ছাড়িয়া জোশীমঠের রাস্তা ধরিলাম। যথা সময়ে জোশীমঠে আসিয়া পৌঁছিলাম। জোশীমঠ * শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত চারিটি প্রধান মঠের মধ্যে অন্যতম।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য সনাতনধর্ম্ম প্রচারার্থ ভারতের চারি প্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করেন। হিমালয়ে জ্যোতির্ম্মী বা জোশীমঠ, দ্বারকাধামে সারদামঠ, দাক্ষিণাত্যে, মহীশূর অঞ্চলে শৃঙ্গগিরি বা শৃঙ্গেরিমঠ, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ভোগবর্দ্ধন বা গোবর্দ্ধনমঠ। তোটক, হস্তামলক, সুরেশ্বরাচার্য্য ও পদ্মপাদ এই চারিজন প্রধান শিষ্যকে যথাক্রমে এই চারিটি মঠের আচার্য্য রূপে ব্রতী করেন। তোটকের শিষ্যগণ গিরি, পর্ব্বত ও সাগর, হস্তামলকের শিষ্যগণ তীর্থ ও আশ্রম, সুরেশ্বরাচার্য্যের শিষ্যগণ সরস্বতী ভারতী ও পুরী এবং পদ্মপাদের শিষ্যগণ বন ও আরণ্য উপাধি গ্রহণ

*ততঃ ক্রোশসপ্তকেচ জোতির্ধাম শুভপ্রদম্।
নৃসিংহরূপী ভগবান্ যত্রাস্তে মুক্তি দায়কঃ।।

কেদারখণ্ড

করেন। এই দশটী উপাধিধারী শিষ্যদিগকে লোকে দশনামী সন্ন্যাসী বলিয়া থাকেন। দ্বারকাধামে, মহীশূরে ও পুরুষোত্তমে এখনও মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের গদী আছে। যাঁহারা উক্ত গদীতে আরোহণ করেন তাঁহারা শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

জোশীমঠ এখন একটি ক্ষুদ্র সহর। সহরে প্রবেশ করিতেই সরকারি ডাকবাঙ্গালা। একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকা। ক্রমে রাস্তার উপরেই পোষ্ট আফিস, তারঘর। রাস্তার দুই ধারে পাথরের অট্টালিকা। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া ৺ বদরীনাথের মোহন্ত মহারাজ রাওল সাহেবের প্রকাণ্ড বাসভবন। বৎসরের মধ্যে ছয় মাস তিনি এখানে থাকেন। বাকী ছয় মাস ৺ বদরীনাথে থাকেন। শীতের ছয়মাস যখন বদরীনাথের মন্দির বন্ধ থাকে তখন বদরীনাথের পূজা জোশীমঠেই হয়।

জোশীমঠ অলকনন্দা ও ধবলী গঙ্গার সঙ্গমস্থল হইতে ১৫০০ ফিট ও সমুদ্র-বক্ষ হইতে ৬১০৭ ফিট উচ্চে অবস্থিত। ইহা চারিদিকে উচ্চ পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। বিশেষতঃ উত্তর দিকের পর্ব্বতমালা অপেক্ষাকৃত উচ্চ। উত্তর দিকের শীতল বাতাস হইতে সহরটিকে যেন রক্ষা করিতেছে।

এখানে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। তন্মধ্যে নৃসিংহ-দেবের মন্দির সর্ব্বপ্রধান। রাস্তা হইতে কয়েকটি সোপান পার হইয়া একটি প্রাঙ্গণে নামিতে হয়। প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে পিতলের হস্তীমুখাকৃতি পথে দুইটি জলধারা। সেই জলধারায় স্নান করিতে হয়। ব্রাহ্মণগণ সকল সময়ে উপস্থিত থাকেন এবং স্নানের সময় যাত্রিদিগকে মন্ত্র পড়াইয়া থাকেন। স্নান করিয়া যাত্রিগণ অন্য একটি প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। এ প্রাঙ্গণটি চতুর্দ্দিকে ঘেরা। তাহার একদিকে নৃসিংহ-দেবের মন্দির।

নৃসিংহদেবকে দর্শন করিয়া যাত্রিগণ প্রধান রাস্তায় আসিয়া পড়েন। সম্মুখেই পিত্তলনির্ম্মিত গরুড়দেবের মূর্ত্তি। নিকটেই বদরীনাথ, কৃষ্ণ, বলরাম, নবদুর্গা ও গণেশের মূর্ত্তি। মন্দিরগুলি অত্যন্ত পুরাতন। প্রায় সবগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

নৃসিংহদেব সম্বন্ধে এখানে একটি গল্প প্রচলিত আছে। এখানে পুরাকালে এক রাজা ছিলেন। তিনি নৃসিংহদেবের প্রধান ভক্ত ছিলেন। নৃসিংহদেব রাজার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া অতিথি বেশে একদিন রাজবাটীতে উপস্থিত হন। তখন রাজা বাটীতে ছিলেন না। রাণী তাঁহাকে পরিপাটিরূপে ভোজন করাইলেন। ভোজনান্তে তিনি রাজার শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। রাজা ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার শয্যায় একজন অপরিচিত পুরুষ শুইয়া আছে দেখিয়া ক্রোধে তাঁহার হস্তে তরবারির আঘাত করিলেন। নিদ্রিতপুরুষের ক্ষত স্থান হইতে রক্তের পরিবর্ত্তে দুগ্ধের ধারা বহির্গত হইতে লাগিল। রাজা ও রাণী বড়ই বিস্মিত হইয়া গেলেন। নৃসিংহদেব রাজার তদবস্থা দেখিয়া স্বরূপ প্রকাশ করিলেন। অতঃপর রাজা মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিলেন যে, মন্দিরস্থ নৃসিংহদেবের হস্তে কে আঘাত করিয়াছে। প্রবাদ, যতদিন এই কাটা হাত এই মূর্ত্তিতে থাকিবে—ততদিন ৺ বদরীনাথের, বদরীনাথে পূজা হইবে। কাটা হাত পড়িয়া যাইলে বদরীনাথের রাস্তা বন্ধ হইয়া যাইবে, এবং আদিবদরী কিম্বা ভবিষ্যবদরীতে যথারীতি তাঁহার পূজা হইবে। জোশীমঠে একটি পুরাতন মন্দির আছে তথায় একটী দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। জনপ্রবাদ তাঁহার সম্মুখে প্রত্যহ নরবলি হইত। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য দেবীকে স্থানচ্যুত করিয়া নরবলি বন্ধ করেন।

জোশীমঠ

জোশীমঠ হইতে একটি রাস্তা তিব্বতের প্রান্তসীমায় নিতি পর্য্যন্ত গিয়াছে—নিতি জোশীমঠ হইতে ৪১ মাইল। এই রাস্তার উপর জোশীমঠ হইতে নয় মাইল দূরে তপোবন নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম:আছে। এই গ্রামের নিকট কতক গুলি উষ্ণ-কুণ্ড ও কতকগুলি ভাঙ্গা মন্দির আছে। চারি মাইল পরে সুচৈ গ্রাম। তথায় পঞ্চবদরীর মধ্যে অন্যতম ভবিষ্য-বদরীর মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

৺বদরীনাথ।

জোশীমঠ হইতে বিষ্ণুপ্রয়াগ—২ মাইল জোশীমঠ হইতে পাণ্ডুকেশ্বর—৮ মাইল।
„ „ বলদুড়া—৩ „ „ „ লামবগড়—১১ „
„ „ ঘাট—৬ „ „ „ হনুমান—১৪ „
জোশীমঠ হইতে ৺বদরীনাথ—১৯ মাইল।

মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া জোশীমঠ হইতে বাহির হইলাম। দুই মাইল ভীষণ উতরাইয়ের পর ধবলী বা বিষ্ণুগঙ্গার তীরে উপনীত হইলাম, নিকটেই অলকনন্দা ও বিষ্ণুগঙ্গার সঙ্গমস্থল। একটি সেতু দিয়া বিষ্ণুগঙ্গা পার হইতে হয়। সেতুটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাহার স্থানে একটি দড়ির পুল। অতি সন্তর্পণে দড়ির পুল পার হইয়া বিষ্ণুপ্রয়াগে যাইলাম। * পুল পার হইলেই বিষ্ণুপ্রয়াগ। সঙ্গমস্থলে নামিবার জন্য পাহাড় কাটিয়া সিঁড়ি করা হইয়াছে। উপরে বিষ্ণুমন্দির। নদী-দ্বয়ের ভীষণ লহরীলীলা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। গিরিরাজ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতে লাগিলেন। গাছপালা যেন কম হইয়া আসিতে লাগিল। সম্মুখে, পশ্চাতে, পার্শ্বে কেবল পাথর—পাথরের উপর পাথর আকাশে গিয়া মিশিয়াছে। এক মাইল পরে বলদুড়া। পুনরায় তিন মাইল পরে ভীষণ গিরিসঙ্কটের ভিতর দিয়া

* বিষ্ণুপ্রয়াগকে স্নাত্বা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবাঃ পরাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়ু॥
কেদারখণ্ড

যাইয়া ঘাট চটি পাইলাম। এই তিন মাইল রাস্তা যে কি ভয়াবহ তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই। মধ্যে লৌহ সেতু দ্বারা অলকনন্দা পার হইতে হয়। ঘাট চটির কিছু দূরে কাক ভূষণ্ডী যাইবার রাস্তা। একটি পুরাতন ধরণের কাঠের পুল পার হইয়া যাইতে হয়। আমাদিগের কাক ভূষণ্ডী যাওয়া হইল না। আমরা বরাবর চলিয়া সন্ধ্যার সময় পাণ্ডুকেশ্বরে আসিয়া পৌঁছিলাম।

পাণ্ডুকেশ্বর একটি বড় গ্রাম। রাস্তার দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধ অনেকগুলি দোকান। গ্রামে অনেক লোকের বাস। পর্ব্বত গাত্রে স্তবকে স্তবকে তাহাদের ঘর বাড়ী রহিয়াছে। সন্ধ্যার সময় সেই সকল বাড়ীতে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বলিলে বড়ই মনোরম দেখাইল। পর্ব্বতের গায়ে কে যেন দীপমালা সাজাইয়া রাখিয়াছে। আমরা একটি দ্বিতল ঘরে আশ্রয় লইলাম। সম্মুখের দোকানে সবই মিলিল। মসলার পর্য্যন্ত অভাব হইল না। পাণ্ডুকেশ্বর একটি ব্যবসায়ের কেন্দ্র। তিব্বত ও ভারত প্রান্তের ভুটিয়ারা এখান হইতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া যায়। শীতকালে ভারতের সীমান্তবাসীরা শীত সহ্য করিতে না পারিয়া নামিয়া আসে, কেহ কেহ শীতের কয় মাস এইখানেই থাকে। আবার কেহ কেহ জোশীমঠ পর্য্যন্ত নামিয়া যায়।

এখানে দুইটি সুন্দর মন্দির আছে। মন্দির দুইটি পাশাপাশি অবস্থিত। একটি বিষ্ণুমন্দির—অপরটি যোগবদরীর মন্দির। যোগবদরী, পঞ্চবদরীর মধ্যে একটি। দুইটি মূর্ত্তিই ধাতুনির্ম্মিত। যোগবদরী শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রবাদ। বাস্তবিক মন্দির দুইটি অত্যন্ত প্রাচীন। মন্দির মধ্যে কতকগুলি তাম্রফলক রক্ষিত আছে। লেখাগুলি

পড়া যায় না। সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ যে, লেখাগুলি কাঠজুড়ি রাজা-দিগের আমলের লেখা।

পাণ্ডারা বলেন যে, পাণ্ডবেরা পরীক্ষিতের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া এইস্থানে আসিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অলকনন্দার অপর পারে একখানি শিলাখণ্ড দেখাইয়া বলেন যে পাণ্ডুরাজা এইস্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন—এবং এইস্থানেই পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম হয়। তাহাদের মতে তাম্রফলকগুলি পাণ্ডু রাজার। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র নাকি ফলকগুলি পড়িবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার মতে এগুলি জমি দানের দলিল মাত্র।

৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার। প্রাতে পাণ্ডুকেশ্বর ছাড়িলাম। ক্রমে শেষধারা, লামবগড়, অতিক্রম করিয়া ঘৃতগঙ্গা ও অলকনন্দার সঙ্গম স্থলে আসিয়া পৌছিলাম। সেতুর সাহায্যে ঘৃতগঙ্গা পার হইয়া হনুমান * চটিতে যাইলাম। চটিটি পাণ্ডুকেশ্বর হইতে ছয় মাইল। এখানে হনুমানের একটি মন্দির আছে। পাহাড়ের উপর বৈখানস মুনির আশ্রম ছিল বলিয়া প্রকাশ। নিকটেই মরুত্ত রাজার যজ্ঞ স্থান। পাণ্ডারা এখনও চতুর্দ্দিকে হোমের ছাই দেখাইয়া থাকেন।

দোকানে সুন্দর পুরি ও জিলাপি বিক্রীত হইতেছে। ঘৃতগঙ্গাতে স্নান করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করা গেল। জলযোগ করিয়া আবার চলিতে

* ততঃ ক্রোশদ্বয়ে দেবি বৈখানস মুনিস্থলম।
যজ্ঞভূমিস্তথা তত্র তেষাং মুনিবরাত্মনাম॥
অদ্যাপি তৎপ্রদেশে বৈ যবাদগ্ধাস্তথা কিল।
অঙ্গারাশ্চাপি দৃশ্যন্তে হোতৃস্থানে মহাত্মনাম॥
কেদারখণ্ড।

আরম্ভ করিলাম। রাস্তার অবস্থা বড়ই শোচনীয়। পাহাড় কাটিয়া রাস্তা করা হইয়াছে। বেশ পরিষ্কার করা হয় নাই। উচু নীচু পাথরের উপর দিয়া যাইতে হইল। স্থানে স্থানে পাহাড়ের চাঙ্গড় ফাটিয়া রহিয়াছে যেন পড়ে পড়ে। স্থানে স্থানে বড় বড় পাথরের চাঙ্গড় ধসিয়া রাস্তার উপর পড়িয়াছে। সেইগুলিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে হইল। আবার ঠিক পার্শ্বে অলকনন্দার স্রোত। বড় বড় পাথরের স্তূপে গতি প্রতিহত হইয়া রাগে ফুলিয়া ফুলিয়া ভীষণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন।

এবার তুষার-ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলাম। মধ্যে মধ্যে মাইলব্যাপী তুষার-ক্ষেত্র পার হইতে হইল। পর্ব্বত, নদী সমস্তই বরফে ঢাকা, দৃশ্য অতীব মহান্। স্থানে স্থানে নদীর চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখা যায় না। বোধ হয় যেন একখানি সাদা ধবধবে চাদর, পর্ব্বতের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত কে বিছাইয়া রাখিয়াছে। কোথায় নদী, কোথায় পাহাড় কিছুরই চিহ্ন নাই।

রাস্তায় কতকগুলি ভুটিয়ার সহিত দেখা হইল। তাহারা ঘোড়ার পিঠে মালপত্র চাপাইয়া স্ত্রী-পুত্রসহ স্বদেশ অভিমুখে যাইতেছে। তাহাদের ভাষা দুর্ব্বোধ্য। অনেক কষ্টে বুঝিলাম তাহাদের বাড়ী ভারতের সীমান্ত প্রদেশে। শীতকালে তথায় কেহই থাকিতে পারে না। শীতের আরম্ভেই ঘর বাড়ী ছাড়িয়া নিম্নে চলিয়া আসে। একটু সমতল ক্ষেত্র খুঁজিয়া লইয়া তাঁবু ফেলিয়া বা পাতার ঘর করিয়া শীতের কয় মাস কোন-রূপে কাটাইয়া দেয়। তাহারা যে স্থানে থাকে তাহার নিকটেই চাষ-আবাদ করিয়া প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করিয়া লয়। তাহারা যখন উপর হইতে নামিয়া আসে তখন তাহাদের নিজেদের প্রস্তুত কতকগুলি কম্বল সঙ্গে আনিয়া থাকে, সেইগুলি বিক্রয় করিয়া যাহা পায়

তাহা হইতেই তাহারা প্রয়োজনীয় খরচ পত্র নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। পরিধানে কম্বলের জামা ও পায়জামা। শরীরের গঠন বলিষ্ঠ, রঙ কিঞ্চিৎ রক্তাভ। ছোট ছোট ছেলেগুলি দেখিতে বড়ই সুন্দর। তাহারা তাঁহাদিগকে ঝুড়িতে বসাইয়া পিঠে করিয়া লইয়া যাইতেছিল। তাহাদের কোন কোন দলে চামরি গরু দেখিতে পাইলাম। গরুগুলি দেখিতে তত সুশ্রী নহে। সর্ব্ব অঙ্গ লোমে আবৃত। বাঙ্গালা দেশের গরু অপেক্ষা আকারে বড়। লেজটি চামর।

একটি বাঁক ফিরিলে ৺নারায়ণের মন্দির দৃষ্টিপথে পড়িল, সকলে আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল "জয় বদরী বিশালা কি জয়!" পুঁটলি পাঁটলি ফেলিয়া সকলেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। চতুর্দ্দিকে আকাশভেদী পর্ব্বতমালা, মধ্যে খরস্রোতা অলকনন্দা। দূরে পাহাড়ের গায়ে মন্দির। অতি রমণীয় দৃশ্য। এই স্থানটি একটু সমতল। এই সমতলের উপর দিয়া চলিতে লাগিলাম—সম্মুখে সরকারি ডাক-বাঙ্গালা। ডাক-বাঙ্গালার পার্শ্বে একজন একখানি খাতা লইয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার কাছে আমাদের নাম ধাম লেখাইতে হইল।

ঋষিপ্রয়াগ পার হইয়া ৺বদরীনাথ ধামে পৌঁছিলাম। বদরীনাথ একটি বড় গ্রাম—দীর্ঘে তিন মাইল, প্রস্থে এক মাইল একটি অধিত্যকার উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার একদিকে নর ও অপরদিকে নারায়ণ পর্ব্বত। একটি রাস্তা গ্রামটিকে ভেদ করিয়া তিব্বত অভিমুখে গিয়াছে। রাস্তার দুই পার্শ্বে সারিবদ্ধ দোকান, নানারূপ দ্রব্য সমূহে পরিপূর্ণ। চাউল ডাইল আটা, ঘি প্রভৃতির অনেক গুলি দোকান ত আছেই, তৎব্যতীত অনেক গুলি ময়রার দোকানও দেখা গেল। এখানে পুরি জিলাপি মাজান রহিয়াছে। পোষ্ট আফিসটি বড়, তৎসঙ্গে একটি টেলিগ্রাফ আফিস

আছে। পাহাড়ের উপর দিকে পাণ্ডাদের বাড়ী ও যাত্রীদের থাকিবার ধর্ম্মশালা। মন্দিরটি গ্রামের সর্ব্বোচ্চ স্থানে নির্ম্মিত। রাস্তা হইতে চল্লিশ কিম্বা পঞ্চাশ ফিট উর্দ্ধে. সমুদ্র-বক্ষঃ হইতে ১০২৮৪ ফিট উচ্চে অবস্থিত। অনুমান অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য্য এই মন্দিরটি স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার স্থাপিত মন্দির এখন নাই, বরফের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান মন্দিরটি পাথরের. চূণ সুরকি দিয়া গাঁথা। দেওয়ালে বালি চূণ ধরান। উপরে একটি গম্বুজ। মন্দিরটি একটি প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব্বদ্বারী একটি প্রশস্ত সোপান-শ্রেণীর উপরে একটি বড় ফটকের ভিতর দিয়া যাইয়া এই প্রাঙ্গণে পড়িতে হয়। প্রবেশ করিয়া বাম দিকে গরুড়জির মূর্ত্তি। সম্মুখে মন্দিরের দ্বার। কপাট লৌহের গরাদে দেওয়া। কপাট প্রায়ই বন্ধ থাকে। মন্দির তিন ভাগে বিভক্ত। উক্ত দ্বার দিয়া প্রথম ভাগে পড়িতে হয়। প্রথম ভাগে কিছুই নাই। পরে একটি দরজা পার হইয়া দ্বিতীয় ভাগে যাইতে হয়। তৃতীয় ভাগে ভগবান ও অন্যান্য দেব দেবীর মূর্ত্তি আছে। তৃতীয় ভাগে পূজারী ব্যতীত কাহাকেও যাইতে দেওয়া হয় না, দ্বিতীয় ভাগ হইতে ভগবানকে দর্শন করিতে হয় মন্দিরে প্রবেশ করিবার দরজাগুলি ব্যতীত আলোক যাইবার অন্য কোন রাস্তা নাই। দীপালোকের সাহায্যে ভগবানের দর্শন লাভ হয়।

মন্দিরের অভ্যন্তরে স্থান অত্যন্ত অপ্রচুর, তজ্জন্য এককালে বহু লোককে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। তৃতীয় ভাগের সম্মুখে একটি সিন্দুক। যাত্রীরা তাহাদের স্ব স্ব ক্ষমতা ও ইচ্ছানুযায়ী প্রণামী একটি পাত্রে সাজাইয়া লইয়া যান এবং এই সিন্দুকে ঢালিয়া দেন। ইহা মন্দির তহবিলে জমা হয়।

মন্দির মধ্যে বিশাল বদরী, বদরীনাথ বা বদরীনারায়ণের মূর্ত্তি পদ্মাসনে

সমাধি মগ্ন। কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত। দক্ষিণ পার্শ্বে নর ও নারায়ণ, বাম পার্শ্বে কুবের ও নারদ। বদরীনারায়ণ দেবের মস্তকের উপর একটি স্বর্ণ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র চন্দ্রাতপ। মস্তকে স্বর্ণের মুকুট, মুকুটে একখণ্ড ভাস্বর হীরক। দেব অঙ্গ মূল্যবান অলঙ্কারে ভূষিত। শোনা গেল, সমস্ত অলঙ্কার, পোষাক-পরিচ্ছদের মূল্য দশ হাজার টাকার কম হইবে না। যে সিংহাসনে মূর্ত্তিটি স্থাপিত তাহারই মূল্য ৪০০০৲ টাকা হইবে।

মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম প্রথম ভাগের দরজাটি বন্ধ। কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হইতেছে না। অনেকগুলি যাত্রী বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন, সকলেই দেবদর্শনে উৎসুক। শুনিলাম মন্দির মধ্যে বিস্তর যাত্রী প্রবেশ করিয়াছে তাহারা বাহির না হইলে নূতন যাত্রীদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে হইল।

ভগবান আমাকে কোথায় আনিলে! আমার কি আছে যাহা আপনার চরণে দিব! আমি অতি দীন দরিদ্র। তবে আমার হিংসা আছে, আমার অহঙ্কার আছে, আমার লোভ আছে, এগুলি লইয়া সমস্ত জীবনই তো অতিবাহিত করিলাম, সমস্ত জীবন ধরিয়াই তো এতগুলি ভূতের বোঝা ঘাড়ে করিয়া বহিলাম। প্রভু এগুলি কি আজ আপনার চরণতলে রাখিয়া যাইতে পারি না? কিন্তু আমার হৃদয়ে তো সে বল নাই। আজ পূর্ব্বজন্মের বহু সুকৃতির ফলে স্বর্গের এই উপকণ্ঠে আসিয়াও যে এগুলিকে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না! প্রভু আমি নরকের কীট, নরকেই আমার স্থান, স্বর্গরাজ্যে আমার অধিকার নাই, তাই বলিয়া কি আপনার করুণা চাহিব না। প্রভু হৃদয়ে শক্তি দিন, মনে সাহস দিন, আজ যখন আপনার

চরণ-তলে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিয়াছি, তখন যেন ফিরিবার সময়েও ঐ ভূতের বোঝাগুলিকে কাঁধে করিয়াই না ফিরি।

একজন কর্ম্মচারী, যেন কতদিনের পরিচিত, আমাদের নিকট আসিয়া আমাদিগকে নানাবিধ মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত করিয়া প্রথম ভাগের মধ্যে লইয়া গেলেন। তথায় অযোধ্যা ও আগরা প্রদেশের কয়েকটি যাত্রী সুললিত ছন্দে ভগবানের স্তব করিতেছিলেন। ক্ষণকাল অপেক্ষার পর আমরা দ্বিতীয়ভাগে প্রবেশ লাভ করিলাম। তখনও তথায় অনেকগুলি যাত্রী রহিয়াছেন। অন্ধকারময় স্থান, অনেকগুলি প্রদীপের আলোকেও ঘরটী সম্পূর্ণ আলোকিত হয় নাই। জয় বদরী বিশালা কি জয়! সম্মুখে বদরী বিশালা। নির্ণিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিলাম।

মন্দির হইতে বাহির হইলাম, প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে লক্ষ্মী দেবীর মন্দির। প্রাঙ্গণ পার হইয়া উপরি উক্ত ফটকের মধ্য দিয়া সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। রাস্তা হইতে কয়েকটি ধাপ নামিলেই "তপ্তকুণ্ড" *। কুণ্ডটি ১৬ ফিট লম্বা এবং প্রায় ১৪ ফিট চওড়া। একটি গরম জলের ও আর একটি ঠাণ্ডা জলের ধারা ইহার মধ্যে পড়িতেছে। ধারাগুলি গোমুখী। গরম জলের ধারা না থাকিলে স্নান করা বড়ই দুরূহ হইত। কুণ্ডের জলে স্নান বড়ই তৃপ্তিকর। ইহার উপরে তক্তার একটি আচ্ছাদন আছে। প্রবাদ, বিষ্ণুর অনুমতিক্রমে অগ্নিদেব তপ্তকুণ্ডে বাস করিতেছেন। তপ্তকুণ্ডের কিঞ্চিৎ উপরে "কেদার" নামে শিবলিঙ্গ। তপ্তকুণ্ডের নিম্নে নদীগর্ভে

* তপ্তোদকময়ী ধারা বহ্নিতীর্থ সমুদ্ভবা।
বর্ত্ততে তত্র সুভগে দেবানামপি দুর্লভা॥
কেদারখণ্ড।

আর একটি কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার নাম নারদ কুণ্ড। পাণ্ডারা বলেন ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই কুণ্ডে ডুব দিয়া বদরীনারায়ণ বিগ্রহ উদ্ধার করিয়াছিলেন। এই কুণ্ডে স্নান করিলে পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। "নারদীয় হ্রদে স্নাত্বা ন ভূয়ঃ স্তনপো ভবেৎ।" ইহার একটু বামদিকে "সূর্য্যকুণ্ড", ইহা একটি উষ্ণ প্রস্রবণ—এখানে কোন কুণ্ড নাই। যাত্রীরা হাতে করিয়া প্রস্রবণের জল লইয়া সমস্ত অঙ্গে ছিটাইয়া দেন। নিকটেই গৌরীকুণ্ড, নৃসিংহধারা, কুর্ম্মধারা ও প্রহ্লাদধারা।

কিছু উত্তরে "ব্রহ্মকপাল" পাহাড়। যাত্রীরা এখানে তাঁহাদের মৃত আত্মীয়দিগের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিয়া থাকেন। পাণ্ডারা বলেন এখানে পিণ্ডদান করিলে আর কোন স্থানে বা কখনও পিণ্ডদান করিতে হয় না।

বদরিকাশ্রমে আসিয়া পঞ্চতীর্থে স্নান ও পঞ্চশীলা এবং কেদার লিঙ্গের দর্শন ও পূজা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। পঞ্চতীর্থের নাম—(১) ঋষিগঙ্গা, (২) কূর্ম্মধারা, (৩) প্রহ্লাদ ধারা (৪) তপ্তকুণ্ড ও (৫) নারদ কুণ্ড।

পঞ্চশীলার নাম—(১) নারদশীলা, (২) বরাহশীলা (৩) নরসিংহশীলা (৪) গরুড় শীলা এবং (৫) মার্কণ্ডেয়শীলা।

ইহা ব্যতীত পবিত্র দেবভূমিতে আগমন করিয়া সকলেরই পঞ্চবদরীর পূজা করা উচিত। পঞ্চবদরী যথা—(১) বদরীনাথে বদরীনারায়ণ (২) পাণ্ডুকেশ্বরে যোগবদরী (৩) জোশীমঠ হইতে তিব্বতের রাস্তায় ভবিষ্য-বদরী (৪) অনিমঠে বৃদ্ধ বদরী ও (৫) হিলঙে ধ্যানবদরী। এই পঞ্চ বদরী অধ্যুষিত সমগ্র ভূভাগ বৈষ্ণব-ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত।

বদরীনাথ ধামে ৺ বদরীনাথের মন্দিরে তিনপ্রকার প্রণামির প্রচলন আছে। (১) থালিভেট (২) আটকাভোগ ও (৩) গদ্দিভেট।

(১) থালিভেট প্রধান প্রণামী। ইহাই ভগবানের উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। যাত্রীরা স্ব স্ব ইচ্ছামত প্রণামী একটি থালায় সাজাইয়া ভগবানের মন্দিরে লইয়া যান। ভগবানকে তাহা দেখাইয়া সম্মুখস্থ সিন্দুকে ঢালিয়া দেন।

(২) আটকা ভোগ—যদি কেহ প্রসাদ পাইতে ইচ্ছা করেন তাহাকে এই প্রণামী দিতে হয়। যিনি যত টাকা দেন তাহার অর্দ্ধেক মূল্যের প্রসাদ পাইয়া থাকেন। প্রাতঃকালে টাকা দিতে হয় বৈকালে প্রসাদ পাওয়া যায়।

(৩) গদ্দিভেট—ইহা রাওল সাহেবের সম্মানার্থ রাওল সাহেবকে দেওয়া হয়। বদরীনারায়ণ দেবের পূজারিকে রাওল সাহেব বলে।

রাওল সাহেবের রীতিমত আফিস আছে। তিন চারিজন কর্ম্মচারী আছেন। এই আফিসে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার প্রণামী জমা দিতে হয়। রীতিমত রসিদ পাওয়া যায়।

বদরীনারায়ণ দেবকে প্রত্যহ প্রাতে স্নান করান হয়। তখন তাঁহার অঙ্গ হইতে সমস্ত অলঙ্কার ও পরিচ্ছদাদি খুলিয়া লওয়া হয়। রাওল ব্যতীত কেহই দেব অঙ্গ স্পর্শ করিতে পান না। বেশভূষাবিমুক্ত মূর্ত্তি "নির্ব্বাণমূর্ত্তি" বলিয়া খ্যাত। নির্ব্বাণমূর্ত্তি দর্শন অতীব সৌভাগ্যসাপেক্ষ।

বদরীনারায়ণ দেবের দুইবার ভোগ হয়। প্রাতঃকালে বাল্যভোগ ও বৈকালে অন্নভোগ। বাল্যভোগ মিষ্টান্ন ভোগ। অন্নভোগ—অন্ন, ডাল, আলুর বড়া, লাড্ডু, পাঁপড় ভাজা, মালপোয়া, আচার ইত্যাদি। ভোগ মন্দিরের মধ্যে সাজাইয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল রাখা হয়। তখন কোন যাত্রীকে মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। দ্বার বন্ধ থাকে। জগন্নাথ-ক্ষেত্রের ন্যায় এখানেও জাতিভেদ নাই। ব্রাহ্মণে

শূদ্রের স্পৃষ্ট ভোগ লইতে কুণ্ঠিত হন না।* ভোগের থালাগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত।

সন্ধ্যার সময় আরত্রিক। সেই সময় নিশামুখে বহুকণ্ঠে উদ্গীত ভগবানের সুললিত স্তবগান শ্রবণ করিলে হৃদয় ভক্তির উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হইয়া যায়, শোক-তাপ-জরা-ব্যাধিময় পৃথিবীর কথা ভুলিয়া শ্রোতৃগণ ক্ষণকালের জন্য যেন শান্ত স্বর্গের ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে। এই পুণ্যভূমি বদরীক্ষেত্রে যিনি একবার ভগবানের স্তবগান শুনিয়াছেন—তিনি তাহা জীবনে কখনও ভুলিবেন না—এখনও সে সঙ্গীতধ্বনি যেন কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে :—

পবনমন্দ সুগন্ধশীতল হেমমন্দির শোভিতম্।
নিকট গঙ্গা বহতি নিরমল শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্॥
শেষ সুমিরণ করত নিশিদিন ধ্যান ধরত মহেশ্বরম্।
শ্রীবেদ ব্রহ্মা করত স্তুতি শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্॥
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের ধুণীকর ধূপদীপ প্রকাশিতম্।
সিদ্ধ মুনিজন করতঃ জয় জয় শ্রীবদরীনাথ বিশ্বম্ভরম্॥ ইত্যাদি।

৺কেদারনাথ দেবের ন্যায় বদরীনারায়ণ দেবেরও বৎসরে ছয়মাস মাত্র এখানে পূজা হয়। শীতকালে যখন চতুর্দ্দিক বরফে আচ্ছন্ন হইয়া যায় তখন তাঁহার পূজা বন্ধ থাকে। অলঙ্কারাদি মূল্যবান দ্রব্যগুলি সমস্তই জোশীমঠে লইয়া যাওয়া হয়। শীতের ছয়মাস জোশীমঠে তাঁহার পূজা হয়। প্রবাদ মন্দির বন্ধ করিবার সময় দুই মণ ঘৃতের একটি প্রদীপ জ্বালাইয়া দরজা বন্ধ করা হয়। এই প্রদীপ শীতের ছয় মাস জ্বলিয়া

* লক্ষ্মীঃ পচতি নৈবেদ্যং ভুংক্তে নারায়ণ স্বয়ম্।
চাণ্ডালেনাপি সংস্পৃষ্টং ন দোষায় ভবেৎ কচিৎ॥
কেদারখণ্ড।

থাকে, ছয় মাসের পর যখন মন্দির প্রথম খোলা হয় তখন ইহার ক্ষীণ শিখা দেখিতে পাওয়া যায়। এই শিখা দর্শন পরম পুণ্যের ফল। ৺বদরীনারায়ণ দেবের পূজার ব্যয়ের জন্য আলমোড়া জেলার ৪৫টি গ্রামের সমুদায় ও ২৬টি গ্রামের আংশিক রাজস্ব এবং গাড়োয়াল জেলার ১৬৪টি গ্রামের সমুদায়, ও ১১১টি গ্রামের কতক রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট আছে। শুনিলাম দেবোত্তর সম্পত্তি ও যাত্রীদত্ত অর্থে মন্দিরের বার্ষিক আয় ন্যূনাধিক ৪৮০০০৲ টাকা।

বদরীনারায়ণ হইতে অগ্রসর হইলে অলকনন্দা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে মানা গ্রাম। এখানে একটি বিষ্ণু-মন্দির আছে। মহাভারতোক্ত মনিভদ্রের বাসস্থান এই স্থানে ছিল বলিয়া প্রকাশ। অলকনন্দা ও সরস্বতীর সঙ্গম কেশব প্রয়াগ নামে অভিহিত। নিকটেই স্কন্দ পুরাণোক্ত মানসদ্ভেদ তীর্থ।

অলকনন্দার বাম তীরে ব্যাসগুহা—এই গুহায় অবস্থান করিয়া মহামুনি ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রকাশ।

মানা হইতে একটি রাস্তা "সত্যপথের" দিকে গিয়াছে। এই রাস্তায় "বসুধারা* নামে একটি জলপ্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়। জল বহু উচ্চ হইতে পড়িতেছে, বায়ু তাড়িত হওয়ায় সময়ে সময়ে বারিকণা সকলের গায়ে লাগে না। তদুপলক্ষে পাণ্ডারা বলেন এখানে পাপপুণ্যের পরীক্ষা হয়। ক্রমে অগ্রসর হইলে সত্যপথ। ইহা একটি ত্রিকোণাকার হ্রদ। এক একটী কোণে এক একটী ঘাট, তাহাদের নাম ব্রহ্মঘাট, বিষ্ণুঘাট, ও মহেশ্বরঘাট। বিষ্ণুঘাটে ও মহেশ্বরঘাটে দুইটি ক্ষুদ্র নদী আসিয়া হ্রদে পড়িয়াছে, হ্রদটির পরিধি প্রায় পৌনে এক মাইল এবং চতুর্দ্দিক বরফে

* বসুধারাভিদং তীর্থং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
পাপিনাং মূর্দ্ধ্নি তত্তোয়বিন্দবো ন পতন্তি

আচ্ছন্ন। ইহা বদরীনাথ হইতে ১৮ মাইল। এখানে যাওয়া বড়ই কষ্টসাধ্য। রাস্তা অত্যন্ত কদর্য্য। থাকিবার স্থান নাই। খাদ্যদ্রব্য কিছুই পাওয়া যায় না। পর্ব্বত গুহাতে থাকিতে হয় ও খাবার জিনিষ সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে হয়। এখানে যাওয়া আমাদের ভাগ্যে ঘটে নাই।

৯ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার—প্রাতে যথাবিধি তপ্তকুণ্ডে ও নিকটবর্ত্তী কুণ্ড-গুলিতে স্নান বা জলস্পর্শ করিয়া ভগবানের নির্ব্বাণ-মূর্ত্তি দর্শন লালসায় মন্দিরাভিমুখে চলিলাম। তখনও মন্দিরের দ্বার খোলা হয় নাই। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর দ্বার খোলা হইল। "জয় বদরী বিশালা কি জয়" সমস্বরে সমবেত জনমণ্ডলী আনন্দধ্বনি করিলেন। বেশবিমুক্ত নারায়ণদেব সকলের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। রাওল সাহেব দেব অঙ্গে চন্দন লেপন করিতেছেন। কাহারও চক্ষে বুঝি পলক পড়িতেছে না।

প্রাঙ্গণস্থিত দেব-দেবী সকলকে যথারীতি পূজা ও অর্চ্চনাদি করিয়া বাসায় ফিরিলাম। টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডার কয়েকদিন হইল পোষ্ট আফিসে পড়িয়া রহিয়াছে শুনিয়া পোষ্ট আফিসে যাইয়া টাকা লইলাম। মধ্যাহ্নে অতি পরিপাটিরূপে ভোজন করা গেল। বড়ই শীত—মধ্যে মধ্যে বাতাস বহিতেছে, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ ঠাণ্ডা হইয়া আসিতেছে। যদিও কেদারনাথের ন্যায় চতুর্দ্দিক বরফে আচ্ছাদিত নহে তবুও রাস্তায় স্থানে স্থানে বরফের স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর সহরটি দেখিতে বাহির হইলাম, সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়াইলাম। ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাধ মিটে না। সন্ধ্যাগমে ভগবানের আরত্রিক দেখিয়া বাসায় ফিরিলাম।

ফিরিবার পথে

কর্ণপ্রয়াগ

চামৌলী হইতে কুয়েড়—১॥০ মাইল।	চামৌলী হইতে ভরত—১০ মাইল।
,, ,, মৈঠানা—৩ ,,	,, ,, লাহাসু—১২ ,,
,, ,, নন্দপ্রয়াগ—৬ ,,	,, ,, জৈকণ্ডী—১৫ ,,
,, ,, সোনলা—৯ ,,	,, ,, কর্ণপ্রয়াগ—১৭ ,,

১০ই জ্যৈষ্ঠ। তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া পূর্ব্বকথিত কুণ্ড গুলিতে স্নান বা জলস্পর্শ করিয়া বদরিনাথ হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে আর একবার ভগবানকে দর্শন করিবার জন্য ছুটিলাম। ভগবানের নির্ব্বাণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। ভগবৎ সমীপে কত প্রাণের কথা, কত অভিযোগ জানাইয়া বাসায় ফিরিলাম। পাণ্ডা ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগের পর, নিরানন্দচিত্তে পুরী ছাড়িলাম। যতদূর দেখা যায় ফিরিয়া ফিরিয়া দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে হনুমান চটি লামবগড় অতিক্রম করিয়া পাণ্ডুকেশ্বরে আসিয়া পৌছিলাম। এখানে মধ্যাহ্ন-ভোজন সমাপন করিয়া অপরাহ্নে জোশীমঠে উপস্থিত হইলাম। এখানে অদ্য রাত্রি যাপন করা গেল।

১১ই জ্যৈষ্ঠ। টঙ্গনিতে মধ্যাহ্ন-ভোজন, ছিনকাতে রাত্রিযাপন।

১২ই জ্যৈষ্ঠ। প্রাতে ছিনকা ছাড়িয়া লালসাঙ্গা বা চামৌলি পাইলাম। কেদারনাথ হইতে আসিবার সময় এখানে আমরা হরিদার বদরীনাথ রাস্তা ধরিয়াছিলাম। আমরা এই রাস্তা ধরিয়াই যাইতে লাগিলাম। কুয়েড়, মৈঠানা চটি পার হইয়া চামৌলি হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী

নন্দপ্রয়াগে* আসিয়া উপনীত হইলাম। পর্ব্বতবেষ্টিত নন্দপ্রয়াগ পঞ্চপ্রয়াগের মধ্যে অন্যতম। এখানে নন্দাকিনীর সহিত অলকনন্দার মিলন হইয়াছে। অনেকে বলেন মহামুনি কণ্ব মুনির আশ্রম এইখানে ছিল। ১৮৯৪ সালে গোহনা বন্যায় এই গ্রামটি একেবারে ভাসিয়া যায়। যেখানে পুরাতন গ্রাম ছিল তাহা হইতে প্রায় ছয়শত হাত উপরে নূতন গ্রাম নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে একটি সুন্দর বাজার ও একটি পোষ্ট আফিস আছে।

নন্দপ্রয়াগে স্নান আহার সমাপন করিয়া যাত্রা করিলাম। একটি লৌহনির্ম্মিত সেতু দিয়া নন্দাকিনী পার হইলাম। সেতুটি ১২০ ফিট লম্বা। সেতুর নিকট হইতে একটি রাস্তা গোয়ালধাম অভিমুখে গিয়াছে। সোনলা ও ভরত চটি পার হইয়া ঠিক সন্ধ্যার সময়ে লাহাসু চটিতে উপস্থিত হইলাম। চটিটি চামোলী হইতে বার মাইল, হরিদ্বার হইতে ১২১ মাইল। একটি সমতল ক্ষেত্রের উপর অবস্থিত। নিকটবর্ত্তী গ্রামে বেশ চাষ আবাদ হইয়াছে। চটিতে অনেকগুলি বড় বড় ঘর আছে। একটি স্রোতের নিকট একটি পরিষ্কার ঘরে আমরা আশ্রয় লইলাম।

---

* কণ্বাশ্রমং সমারভ্য যাবন্নন্দগিরির্ভবেৎ।
তাবৎক্ষেত্রং পরংপুণ্যং ভুক্তিমুক্তি প্রদায়কম্॥
কণ্বো নাম মহাতেজা মহর্ষি লোকবিশ্রুতঃ।
তস্যাশ্রমপদে গত্বা ভগবন্তং রমাপতিম্॥
দুরাত্মনোঽপি গচ্ছন্তি পদং দুঃখবিবর্জ্জিতম।
নন্দপ্রয়াগকে স্নাত্বা সংপূজ্য চ রমাপতিম॥
কিং কিং ন জায়তে তস্য মুক্তি স্তস্য করে স্থিতা।
ধন্যাঃ কলিযুগে ঘোরে যে নরাঃ বদরীং গতা॥

কর্ণপ্রয়াগ।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ। প্রাতে যাত্রা করিয়া পাঁচ মাইল চলিয়া কর্ণ ও অলকনন্দার সঙ্গমস্থল কর্ণ প্রয়াগে আসিয়া পৌঁছিলাম। প্রবাদ এই স্থানে কর্ণ তপস্যা করিয়াছিলেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া সূর্য্যদেব তাঁহাকে স্থবর্ণ মণিমাণিক্য ও ধনরত্নাদি দান করেন। এখানে দাতাকর্ণের একটি মন্দির আছে। ইহা ব্যতীত পাহাড়ের উপর চণ্ডিকাদেবীর একটি মন্দির আছে। এ অঞ্চলে সমতল-ক্ষেত্র প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। নিকটেই একটি সমতল-ক্ষেত্র পাইয়া তাহা গোচারণের মাঠে পরিণত করা হইয়াছে।

কর্ণপ্রয়াগ হরিদ্বার হইতে ১১৬ মাইল ও সমুদ্র-বক্ষঃ হইতে ২৩০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। কর্ণপ্রয়াগ একটি বড় গ্রাম। অনেকগুলি দোকান, হাঁসপাতাল, ডাকঘর ও তারঘর আছে। গোহনা বন্যার প্রতাপ এখানেও পরিলক্ষিত হয়।

মেহেল চোরা।

কর্ণপ্রয়াগ	হইতে	পাটলি—২	মাইল।	কর্ণপ্রয়াগ	হইতে	কালিমাটি—২০	মাইল।
"	"	সিমলি—৪	"	"	"	গোয়ার—২১	"
"	"	সিরোলী—৬	"	"	"	নারায়ণ—২২	"
"	"	ভাটোলী—৭॥	"	"	"	ধূনারঘাট—২৩	"
"	"	আদিবদ্রী—১১৮	"	"	"	আরাম—২৪	"
"	"	জঙ্গল—১৬॥	"	"	"	হনুমান—২৫	"
"	"	দেওয়ালি—১৮॥	"	"	"	মেহেল চোরী—২৯	"

২২১ ফিট লম্বা একটি সেতুর সাহায্যে কর্ণ বা পিণ্ডার নদী পার হইলাম। নদী পার হইয়া দুইটি রাস্তা পাইলাম। প্রধান রাস্তাটি কর্ণপ্রয়াগের অভিমুখে গিয়াছে। অপর একটি শাখারাস্তা রামনগর রেল ষ্টেশনের দিকে গিয়াছে। বদরীনাথ হইতে ফিরিবার সময় যাত্রীরা এই শেষের রাস্তা দিয়া রামনগরে যাইয়া থাকেন। গতানুগতিকের ন্যায় আমরাও রামনগরের রাস্তা ধরিলাম। দুই মাইল দূরে পাটলি ছাড়াইয়া আরও দুই মাইল চলিবার পর সিমলি চটিতে উপনীত হইলাম। এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছি পর্ব্বত ছাড়িয়া আমরা সমতল ক্ষেত্রের দিকে যাইতেছি। সিমলি চটিটি একটি সমতল ক্ষেত্রের উপর অবস্থিত। নিকটবর্ত্তী নদীতে অবগাহন স্নান করিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন সারিয়া লইলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় আবার রাস্তা ধরিলাম। কতক চড়াই কতক উতরাইয়ের পর সিরোলি চটি। দেড় মাইল পরে

ভটৌলী। ভটৌলী হইতে দুই মাইল পরে একটি নূতন চটি দেখা গেল—নিকটেই একটি রাস্তা পৌড়ীর দিকে, অপর একটি রাস্তা লোভার দিকে গিয়াছে। প্রায় চারি মাইল অতিক্রম করিলে আদিবদরী। আদিবদরী কর্ণপ্রয়াগ হইতে প্রায় বার মাইল এবং লোভা হইতে প্রায় দশ মাইল। লোভার রাস্তা দেওয়ালি খাল নামক গিরিসঙ্কট পার হইয়া দেওয়ালি পর্ব্বতমালা পার হইয়া চলিয়া গিয়াছে। এই গিরিসঙ্কটের নিকটে একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার দেড় মাইল নিম্নে ডিমডিমা নামক স্থানে বনবিভাগের একটি বাংলা আছে। রাস্তার দুই পার্শ্বে কতকগুলি পর্ব্বতশৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের উচ্চতা ৫০০০ হইতে ৮৫০০ ফিট। আদিবদরীর কিঞ্চিৎ উত্তর পূর্ব্বদিকে একটি হ্রদ আছে।

আদিবদরীতে ১৬টি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরগুলি ৮৫ ফিট লম্বা ও ৪২ ফিট চওড়া একটি পাথরের চত্বরের উপর নির্ম্মিত। মন্দিরগুলি উচ্চে ৬ ফিট হইতে ২০ ফিট হইবে। তাহাদের মধ্যে অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মীনারায়ণ, বদরীনারায়ণ, সত্যনারায়ণ, গরুড়, জানকী, ব্রহ্মা, কেদারেশ্বর, অঞ্জনা ও গৌরীশঙ্কর দেবের মূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরগুলি নাকি মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। স্থানীয় ব্রাহ্মণেরা এই সকল দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকেন।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার। প্রাতে আদিবদরী ছাড়িলাম। ধীরে ধীরে জঙ্গল, দেওয়ালি, কালিমাটি, গোয়ার ও নারায়ণ অতিক্রম করিলাম। নারায়ণ চটির নিকটেই একটি সুন্দর ইনস্পেক্সন বাংলা। পরে ধূনার ঘাট—একটি বড় চটি, এখানে পোষ্ট আফিস, বাজার ইত্যাদি আছে। মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিয়া ঠিক সন্ধ্যার সময় মেহেলচৌরিতে আসিয়া

পৌছিলাম। এই চটিটী গাড়োয়াল ও আলমোরা জেলার সীমান্তে অবস্থিত। চটিটি বড়ই অপরিষ্কার। খাবার দ্রব্য কিছুই পাওয়া যায় না। আগে মনে করিয়াছিলাম যে দুইটি জেলার সন্ধিস্থলে অবস্থিত এই চটিটি নিশ্চয় আকারে বড় হইবে এবং দোকানপত্রের সংখ্যাও বেশী হইবে। এখানে ঝাঁপান বদল করিতে হয়—সেজন্য আফিস আছে—না জানি কত বড় সহরই হইবে। কিন্তু চটিতে পৌঁছিয়া ইহার শ্রী দেখিয়াই তো আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। দোকান পসারি কিছুই নাই, খানকতক নীচু চালা ঘর। তাহাতেই যাত্রীরা অতি কষ্টে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করেন। ঝাঁপানিরা তাহাদের প্রাপ্য সমুদায় বুঝিয়া লইয়া এই স্থানে আমাদের নিকট বিদায় লইল। তাহারা তাহাদের জেলা ছাড়িয়া অন্য জেলায় যাইতে চাহেনা। এখান হইতে রামনগর রেল ষ্টেশন ৭০ মাইল। যাইবার জন্য আমাদের নূতন বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই তেইশ দিন একত্র থাকিয়া ঝাঁপানি-কুলিরা আমাদের এত আপনার লোক হইয়া গিয়াছিল যে এই বিদায় বড়ই কষ্টকর বোধ হইল। তাহারা আমাদিগকে ছাড়িয়া কতক দূর [illegible] ফিরিয়া আসে, যেন আমাদের ছাড়িয়া যাইতে তাহাদের প্রাণে [illegible] কেবল শঙ্কর আমাদের সঙ্গে রহিল—সে আমাদিগকে [illegible] পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিবে।

এখান হইতে রামনগর পর্য্যন্ত এক এক খানি ঝাঁপানের ভাড়া ৩০৲ টাকা। যাঁহারা ঘোড়ায় চড়িতে পারেন তাহাদের খুব সুবিধা। এখানে ঘোড়া পাওয়া যায়—নয় টাকাতেই রামনগর পৌছাইয়া দেয়। আমরা দুইটি ঝাঁপান নিযুক্ত করিলাম। ভায়া ও আমি অশ্বারোহণে যাইব স্থির করিলাম। মালপত্র লইয়া যাইবার জন্য আর একটি ঘোড়া লইতে হইল তাহাকে আট টাকা দিতে হইবে।

রামনগর।

মেহেলচৌরী হইতে সিমলক্ষেত—২ মাইল।
,, ,, নারায়ণ—৪ ,,
,, ,, রাম—৬ ,,
,, ,, গনাই বা চৌখুটিয়া—৮ ,,
,, ,, ভাটকোট—৯ ,,
,, ,, চিনৌণী—১১ ,,
,, ,, ভগবতী—১২ ,,
,, ,, গণেশ—১৩ ,,
,, ,, বাণালী—১৪ ,,
,, ,, মাসী—১৫ ,,
,, ,, একটি ছোট চটি—১৭ ,,
,, ,, বৃদ্ধ কেদার—১৯॥০ ,,
,, ,, সোন্না—২০॥০ ,,
,, ,, বাগেড়ী—২১॥০ ,,
,, ,, নওলা—২[illegible] ,,
,, ,, জয়নাল—২[illegible] ,,

মেহেলচৌরী হইতে ধারো—২৫ মাইল।
,, ,, ভিখিয়াসেন—২৬ ,,
,, ,, শ্রী[illegible]ট—২৯ ,,
,, ,, [illegible]কোট—৩১॥০ ,,
,, ,, [illegible]সিম—৩৩ ,,
,, ,, [illegible]সিম—৩৬ ,,
,, ,, [illegible]টি—৩৭ ,,
,, ,, একটি ছোট চটি—৪২ ,,
,, ,, [illegible]দি—৪৪ ,,
,, ,, টোটাম—৫০ ,,(১)
,, ,, সৌ[illegible]—৫২॥০ ,,
,, ,, [illegible]—৫৭ ,,(২)
,, ,, [illegible]—৬[illegible] ,,
,, ,, গরাময়া—৬৩ ,,
,, ,, ঢিকুলি—৬৪ ,,
,, ,, [illegible]নগর—৭০ ,,

(১) গদি হইতে টোটাম [illegible] পথে দুই মাইল।

(২) টোটাম হইতে ডুমোরিয়া জঙ্গলপথে দুই মাইল।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার। অতি প্রত্যূষে [illegible] অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই রওনা হওয়া গেল। ভায়া ও আমি অশ্বপৃষ্ঠে। ঘোড়ায় চড়া অনেকদিন অভ্যাস না থাকায় একটু বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। আবার

পৌঁছিলাম। এই চটিটী গাড়োয়াল ও আলমোরা জেলার সীমান্তে অবস্থিত। চটিটি বড়ই অপরিষ্কার। খাবার দ্রব্য কিছুই পাওয়া যায় না। আগে মনে করিয়াছিলাম যে দুইটি জেলার সন্ধিস্থলে অবস্থিত এই চটিটি নিশ্চয় আকারে বড় হইবে এবং দোকানপত্রের সংখ্যাও বেশী হইবে। এখানে ঝাঁপান বদল করিতে হয়—সেজন্য আফিস আছে—না জানি কত বড় সহরই হইবে। কিন্তু চটিতে পৌঁছিয়া ইহার শ্রী দেখিয়াই তো আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। দোকান পসারি কিছুই নাই, খানকতক নীচু চালা ঘর। তাহাতেই যাত্রীরা অতি কষ্টে কয়েক ঘণ্টা অতিবাহিত করেন। ঝাঁপানিরা তাহাদের প্রাপ্য সমুদায় বুঝিয়া লইয়া এই স্থানে আমাদের নিকট বিদায় লইল। তাহারা তাহাদের জেলা ছাড়িয়া অন্য জেলায় যাইতে চাহেনা। এখান হইতে রামনগর রেল ষ্টেশন ৭০ মাইল। যাইবার জন্য আমাদের নূতন বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই তেইশ দিন একত্র থাকিয়া ঝাঁপানি-কুলিরা আমাদের এত আপনার লোক হইয়া গিয়াছিল যে এই বিদায় বড়ই কষ্টকর বোধ হইল। তাহারা আমাদিগকে ছাড়িয়া কতক দূর [illegible] ফিরিয়া আসে, যেন আমাদের ছাড়িয়া যাইতে তাহাদের প্রাণে [illegible] কেবল শঙ্কর আমাদের সঙ্গে রহিল—সে আমাদিগকে [illegible] পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে।

এখান হইতে রামনগর পর্য্যন্ত এক এক খানি ঝাঁপানের ভাড়া ৩০৲ টাকা। যাঁহারা ঘোড়ায় চড়িতে পারেন তাহাদের খুব সুবিধা। এখানে ঘোড়া পাওয়া যায়—নয় টাকাতেই রামনগর পৌঁছাইয়া দেয়। আমরা দুইটি ঝাঁপান নিযুক্ত করিলাম। ভায়া ও আমি অশ্বারোহণে যাইব স্থির করিলাম। মালপত্র লইয়া যাইবার জন্য আর একটি ঘোড়া লইতে হইল তাহাকে আট টাকা দিতে হইবে।

(৩)

রামনগর।

মেহেলচৌরী	হইতে	সিমলক্ষেত—২	মাইল।
,,	,,	নারায়ণ—৪	,,
,,	,,	রাম—৬	,,
,,	,,	গনাই বা চৌথুটিয়া—৮	,,
,,	,,	ভাটকোট—৯	,,
,,	,,	চিনৌণী—১১	,,
,,	,,	ভগবতী—১২	,,
,,	,,	গণেশ—১৩	,,
,,	,,	বাগালী—১৪	,,
,,	,,	মাসী—১৫	,,
,,	,,	একটি ছোট চটি—১৭	,,
,,	,,	বৃদ্ধ কেদার—১৯॥০	,,
,,	,,	সোন্না—২০॥০	,,
,,	,,	বাসেড়ী—২১॥০	,,
,,	,,	নওলা—২[illegible]	,,
,,	,,	জয়নাল—২[illegible]	,,

মেহেলচৌরী	হইতে	ধারো—২৫	মাইল।
,,	,,	ভিখিয়াসেন—২৬	,,
,,	,,	শ্রীকোট—২৯	,,
,,	,,	[illegible]কোট—৩১॥০	,,
,,	,,	[illegible]সম—৩৩	,,
,,	,,	[illegible]সিম—৩৬	,,
,,	,,	[illegible]কোট—৩৭	,,
,,	,,	একটি ছোট চটি—৪২	,,
,,	,,	গদি—৪৪	,,
,,	,,	টৌটাম—৫০	,,(১)
,,	,,	সৌনা[illegible]—৫২॥০	,,
,,	,,	কুমেরিয়া—৫৭	,,(২)
,,	,,	চ[illegible]—৬০	,,
,,	,,	গরাজরা—৬৩	,,
,,	,,	ঢিকুলি—৬৪	,,
,,	,,	রামনগর—৭০	,,

(১) গদি হইতে টৌটাম জঙ্গল পথে দুই মাইল।

(২) টৌটাম হইতে কুমেরিয়া জঙ্গলপথে দুই মাইল।

১৫ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার। অতি প্রত্যুষে উঠিয়া অন্ধকার থাকিতে থাকিতেই রওনা হওয়া গেল। ভায়া ও আমি অশ্বপৃষ্ঠে। ঘোড়ায় চড়া অনেকদিন অভ্যাস না থাকায় একটু বাধ বাধ ঠেকিতে লাগিল। আবার

প্রথমেই একটি ভীষণ চড়াই। বড়ই ভয় হইতে লাগিল। ঘোড়া ও ঘোড়সহর একসঙ্গে গড়াইতে গড়াইতে একবারে গভীর তলশায়ী হইতে না হয়। এক একবার ভাবিতে লাগিলাম, ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়ি, পরক্ষণে লজ্জা আসিয়া বাধা দিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় চড়ায়ের উচ্চতম স্থানে আসিয়া পৌছিলাম। উত্তরাইতে তত ভয় হইল না। ধীরে ধীরে নামিতে লাগিলাম, বনের মধ্য দিয়া রাস্তা। বড় বড় গাছ সকল আকাশ মাথায় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শাখা প্রশাখা ছড়াইয়া পথিকগণের শ্রান্তি দূর করিতেছে। এইরূপ পথে প্রায় তিন মাইল উতরাইয়ের পর সমতল জমি পাইলাম। আর ভয় নাই। মনে আশার সঞ্চার হইল। সিমলক্ষেত, নারায়ণ, রাম প্রভৃতি চটি পার হইয়া গনাই বা চৌখুটিয়াতে আসিয়া পৌছিলাম। রৌদ্রের তাপ ক্রমশঃ বাড়িতেছে, দশটা এগারটার পর আর চলিতে পারা যায় না। এই চটিটি বেশ বড়, একটি প্রশস্ত সমতল ক্ষেত্রের উপর অবস্থিত, সম্মুখেই রামগঙ্গা নদী। নিকটেই ডাক-বাংলা, ডাকঘর, পুলিশফাঁড়ি ও ডাক্তারখানা। এখান হইতে একটি রাস্তা রাণীক্ষেত অভিমুখে গিয়াছে। পূর্ব্বে রাণীক্ষেতের রাস্তা দিয়া যাত্রীরা প্রত্যাবর্ত্তন করিত। এক্ষণে রামনগর রেলষ্টেশন খোলায় যাত্রীরা গুজার ঘটির রাস্তায় যায়। রাণীক্ষেতের রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রাণীক্ষেতে ছাউনি থাকায় ঐ রাস্তায় যাত্রিদের বোধ হয় একটু অসুবিধা হইত।

গনাইয়ের পূর্ব্ব দিকে একটি উপত্যকা আছে। এই উপত্যকায় গনাই হইতে তিন মাইল দূরে তড়াগ-তাল নামে একটি হ্রদ আছে।

গনাই চটিতে বিশ্রাম করিয়া অপরাহ্ণে রামগঙ্গার পুল পার হইয়া গুজার ঘাটির রাস্তা ধরিলাম। পুল পার হইলে একটি রাস্তা পৌড়ীর দিকে গিয়াছে। পৌড়ীর পথে গনাই হইতে দুই মাইল দূরে এক্ষণে একটি নগরের

ধ্বংশাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। যাত্রীপথ ধরিয়া ভটকোট, চিনৌনি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চটি পার হইয়া সন্ধ্যার সময় মাসী নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। গ্রামটিতে অনেকগুলি মুসলমানের বাস। এখানে যাত্রিদিগকে চটি-ঘরের ভাড়া দিতে হয়। যাত্রিসংখ্যার উপর ঘরের ভাড়ার তারতম্য নির্ভর করে। সম্মুখেই রামগঙ্গা নদী, কিন্তু নদীর জল কেহই ব্যবহার করে না। শঙ্কর প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরস্থিত একটি ইঁদারা হইতে জল আনিলেন। রামগঙ্গা পার হইয়া পৌড়ী যাইবার একটি রাস্তা আছে। এই চটিতে আমরা রাত্রি যাপন করিলাম।

১৬ইজ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার। প্রত্যুষেই যাত্রা করিয়া ছোট ছোট অনেক গুলি চটি পার হইয়া ১১মাইল দূরে ভিখিয়াসেন নামক চটিতে মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন করা গেল। চটিটি গগাস (চন্দ্রভাগা) ও রামগঙ্গা নদীর সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত। সঙ্গম-স্থলে নকুলেশ্বর দেবের একটি মন্দির আছে। ভিখিয়াসেন একটি বড় চটি। এখানে অল্পক্ষণ মাত্র থাকিব ভাবিয়া ভাল বাসার অনুসন্ধানে সময়ক্ষেপ না করিয়া নিম্নতলেই একটি ঘর লইয়া তাহা অধিকার করিয়া বসিলাম কিন্তু নিম্নতলস্থ ঘর লইয়া বড়ই ঠকিলাম। দ্বিতলের মেজেটি তক্তা ও মাটী দিয়া নির্ম্মিত। উপরের ঘরের জল মাটি ভেদ করিয়া নিম্নে পড়িতে লাগিল। উপরিস্থ যাত্রিদিগকে কিছু সতর্ক করিয়া তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া লওয়া গেল। যথাপূর্ব্ব তিনটার সময় রওনা হইলাম। নদী পার হইয়া একটি পাহাড়ে উঠিতে হইল। আমি এখনও অশ্বপৃষ্ঠে। বড় ভয় হইতে লাগিল, কিন্তু অশ্বটি বড়ই শান্ত ও শিক্ষিত। সে নিজ গন্তব্য পথে আপন মনে ধীরে ধীরে পদবিক্ষেপ করিয়া চলিতে লাগিল। আমাকে কিছুই করিতে হইল না। এইরূপ প্রায় তিন মাইল চড়াইয়ের পর শ্রীকোট মিলিল। এখান হইতে রাস্তাটি চওড়া হইতে আরম্ভ

হইল। অনেকগুলি গরুর গাড়ী দেখা গেল। যাত্রীরা এই স্থান হইতে গরুর গাড়ীতে রামনগর যাইয়া থাকেন। এক এক খানি গরুর গাড়ীতে চারিজন করিয়া আরোহী থাকে। ভাড়া তিন চারি টাকা। আড়াই মাইল অগ্রসর হইলে ব্যাসকোট। এইখানে রাত্রিযাপন করিতে মনস্থ করিলাম। এখানকার ঘরগুলি তত ভাল নয়। ঘরের সংখ্যাও অল্প। যাত্রী অনেকগুলি আসিয়া জুটিলেন, সকলের বুঝি স্থান সঙ্কুলান হয় না। কিন্তু যাত্রিদের মধ্যে সকলের মনের ভাব একরূপ। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। আশ্রয় পাইতে কাহারও বিশেষ কষ্ট হইল না। অতি অল্প জায়গায় সকলেরই থাকিবার স্থান কুলাইয়া গেল। নানাদেশ হইতে নানা ভাষী যাত্রিদের সহিত অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নানা বিষয় কথোপকথন করিতে করিতে সময় কাটিয়া গেল। আগরা ও অযোধ্যা প্রদেশবাসী একটি স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টারের সহিত আলাপ হইল। চটিগুলি পরিদর্শন করা তাঁহার কার্য্য। কতকগুলি করিয়া চটি এক এক জন ইন্‌স্পেক্টারের তত্ত্বাবধানে আছে। চটিগুলি যথাসাধ্য পরিষ্কার রাখিতে তাঁহারা সততই যত্নবান। তাঁহাদের জন্য দোকানে কেহই অস্বাস্থ্যকর খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করিতে পারেন না। ঝাড়ুদার ও মেথরগণ নিজ নিজ কাজে অবহেলা করিবার সুযোগ পায় না। এই চটিটি গরুর গাড়ীর একটি প্রধান আড্ডা।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, শনিবার। সূর্য্য উঠিবার অনেক আগেই আমরা যাত্রা করিলাম। পথে একটি সুন্দর হাঁসপাতাল দেখিতে পাইলাম। এক মাইল অন্তর দুই একটি চটি পার হইয়া রামনগর রাণীক্ষেত রাস্তায় গুজার ঘাটীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। গুজারঘাটি হইতে রামনগর ৩৩ মাইল। রাস্তাটি খুব চওড়া, সৈন্য যাতায়াতের জন্য প্রস্তুত; খুব চওড়া বলিয়া

ঘোড়সহয়ে যাইতে আর কোন ভয় হইতেছে না—স্বচ্ছন্দে যাইতে লাগিলাম। ছোট ছোট চটিগুলি পার হইয়া সাত মাইল দূরে গদীচটিতে উপনীত হইলাম। মধ্যবর্ত্তী চটিগুলিতে বড়ই জলকষ্ট। গদীচটিতে একটি সুন্দর প্রস্রবণ আছে, অনবরত জল পড়িতেছে। এজন্য এখানে যাত্রিসংখ্যা বেশী। আনন্দের সহিত জলধারাতে স্নান করিয়া লইলাম। যদিও জল অত্যন্ত ঠাণ্ডা তথাপি বড়ই প্রীতিকর। এখানে একটি যুক্তপ্রদেশবাসী ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। তিনি মাতা ও স্ত্রীর সহিত তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। কাণ্ডি করিয়া কেদারবদরী পরিক্রম করিতেছেন, রাস্তায় কাণ্ডিওয়ালা কাণ্ডিটি ফেলিয়া দিয়াছিল। মাতা মস্তকে এরূপ আঘাত পাইয়াছেন যে তাঁহার মস্তিষ্ক একেবারে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে যেখানে বসাইয়া রাখা হয় সেইখানেই বসিয়া থাকেন। প্রশ্নের কোন জবাব দিতে পারেন না। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলে হাত ধরিয়া লইয়া যাইতে হয়।

আহারান্তে ঘরে বসিয়া রাস্তা দেখিতে লাগিলাম। দলে দলে লোক যাতায়াত করিতেছে, কেহ পদব্রজে, কেহ বড় বড় গোযানে, কেহ বা অশ্বপৃষ্ঠে। নানাবিধ দ্রব্যপরিপূর্ণ বড় বড় গোযান সারি দিয়া যাইতেছে। রাস্তার অপর পার্শ্বে পর্ব্বতের প্রাচীর আর নাই। রাস্তার ঠিক নিম্নে খাদ—পরেই তরঙ্গায়িতভাবে পাহাড় চলিয়া গিয়াছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিয়া দূরে গিয়া মিশিয়াছে।

অপরাহ্নে তিনটার সময় আবার রওনা হইলাম। রাস্তা প্রশস্ত, অশ্বপৃষ্ঠে যাইতে আর ভয় হয় না। কিছুদূর যাইয়া একটী সরু রাস্তা প্রধান রাস্তা হইতে বাহির হইয়া ক্রমশঃ নিম্নদিকে গিয়াছে। সঙ্গীদের কথামত আমরা সেই রাস্তা ধরিলাম, প্রশস্ত শকট-পথ ছাড়িয়া দিলাম।

দুই মাইল নামিয়া টোটাম নামক স্থানে পুনরায় শকট পথ পাইলাম। শকট-পথ দিয়া আসিলে আমাদের ছয় মাইল ঘোর হইত। টোটামে একটি সুন্দর বাংলা আছে। দুই মাইল অবতরণের পর অত্যন্ত তৃষ্ণা পাইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী একটি স্রোতের জলে তৃষ্ণা দূর করিলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া আবার যাইতে লাগিলাম। সঙ্গিদিগকে ছাড়িয়া দিয়া সুন্দর প্রশস্ত পথে অশ্বপৃষ্ঠে প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। রাস্তার একদিকে বৃক্ষরাজিশোভিত পর্ব্বতশ্রেণী—অপর দিকে খাদ—খাদের ভিতর হইতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাদপসমূহ মস্তক উত্তোলন করিয়া তাহার অস্তিত্ব লুকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। অশ্বটি মহানন্দে আপন মনে বেগে যাইতে লাগিল। সেও যেন স্বভাবের সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া গেল। আরোহী বল্গা ছাড়িয়া দিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল মাত্র। এক একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে লাগিল—সঙ্গিরা কতদূরে। কিন্তু সঙ্গিদের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করি মনে করিলাম, কিন্তু অশ্ব থামিতে চাহিতেছে না। দুই মাইল দূরে সৌরাল চটি ছাড়িয়া চলিলাম। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম সঙ্গিদিগকে দেখিতে পাইলাম না। অশ্ব অবিরাম গতিতে চলিতেছে। রাস্তা একই প্রকার, এক পাশে পাহাড়, আর অন্য পাশে খাদ। খাদ বৃক্ষে আচ্ছাদিত থাকায় তত ভয়াবহ নহে। যাইতে যাইতে একটি ইউরোপীয় ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র তিনি ইয়ুরোপীয় প্রথানুসারে সম্ভাষণ করিলেন। যথারীতি প্রতিসম্ভাষণ করিলাম। তিনি একজন রেলওয়ে সারভেয়ার। রেলপথ এখন রামনগর পর্য্যন্ত আসিয়াছে এবং আরও খানিকটা পর্ব্বতের মধ্যে আনিবার চেষ্টা হইতেছে। পর্ব্বতের অবস্থা দেখিতে তিনি নিযুক্ত হইয়াছেন। নিকটেই

নদীতীরে তাঁহার তাম্বু। তিনি আর অগ্রসর হইলেন না। আমার সহিত ফিরিলেন। দুইজনে কথোপকথন করিতে করিতে ঠিক সন্ধ্যার সময় কুমেরিয়া চটিতে আসিয়া পৌঁছিলাম। ভদ্রলোকটি আমাকে চটিতে পৌঁছাইয়া দিয়া তাম্বুর দিকে যাইলেন।

চটিতে প্রবেশ করিয়া দেখি সঙ্গীরা সকলে সেখানে বসিয়া আছেন। বড়ই আশ্চর্য্য হইলাম—তাঁহারা কি করিয়া এখানে আমার আগে আসিয়া পৌঁছিলেন। শুনিলাম টোটাম ছাড়িয়া তাঁহারা একটি জঙ্গল পথ ধরিয়াছিলেন। সেপথে এই স্থানটী টোটাম হইতে দুই মাইল মাত্র। আর আমাকে ছয় মাইল ঘুরিয়া আসিতে হইয়াছে।

কুমেরিয়া একটি বড় চটি—খানিকটা সমতল জমির উপর অবস্থিত। সম্মুখেই একটি নদী, স্রোত প্রচণ্ড। শুনিলাম দুই এক দিন আগে হঠাৎ বান আসিয়া আরোহিসহ একটি গরুর গাড়ী ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। এই চটিতে আজ বিশ্রাম করিলাম। এখান হইতে রামনগর তের মাইল মাত্র।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, রবিবার। অতি প্রত্যুষেই সকলে যাত্রা করিলাম। সম্মুখ দিয়া একটি প্রশস্ত শকট-পথ গিয়াছে। আমরা সে পথ ছাড়িয়া একটি সোজা পথ ধরিলাম। এটিও শকট-পথ, তবে প্রথমটির অপেক্ষা কম চওড়া। আমাদিগকে পূর্ব্বোক্ত নদীটি পার হইতে হইল। নদীর পুলটি ভাঙ্গা, খানকয়েক কাঠ ফেলা আছে মাত্র—তাহার উপর দিয়া অতি সন্তর্পণে পদব্রজে পার হইলাম। এখানে অনেক যাত্রীর সহিত দেখা হইল। যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম ততই সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতে লাগিলাম। ক্রমাগত নদীর ধার দিয়া যাইতে লাগিলাম। নদীর গর্ভ রাস্তা হইতে অধিক নিম্নে নহে। এক স্থানে নদীগর্ভে স্তম্ভের

স্থায় একটি খাড়া পাহাড় দেখিতে পাওয়া গেল। তাহার মাথার উপরে একখানি ঘর। এই ঘরখানি ব্যতীত আর একটুও জমি নাই। নদীটি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতেছে। অবশেষে আমাদের ঠিক সম্মুখে আসিয়া পড়িল। এখানে একটি পুল ছিল, এখন নাই, তাহার নিদর্শন আছে মাত্র। একটি অল্প গভীর স্থান দেখিয়া পদব্রজে নদী পার হইলাম। ক্রমে চকখুলা, গরজিয়া অতিক্রম করিয়া ঢিকুলীতে আসিয়া পৌছিলাম। ঢিকুলী রামনগর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ছয় মাইল মাত্র। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চে ১৩৮০ ফিট। বোধ হয় পূর্ব্বে ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। মাটির কয়েক ফিট নিম্নেই পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে ইহা একটি সুন্দর গ্রাম—বেশ চাষ আবাদ হইতেছে। পাহাড় আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছে। রাস্তার দুই পার্শ্বে সমতল ক্ষেত্র পাহাড় হইতে ঢলিয়া পড়িতেছে। স্থানে স্থানে রাস্তার পার্শ্বে সারিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণী পথিকগণের শ্রান্তি দূর করিতেছে। ক্রমেই সূর্য্যের উত্তাপ অধিক হইতে অধিকতর হইয়া পড়িতেছে, ক্রমে ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। অধিকক্ষণ কষ্ট করিতে হইল না। প্রায় ১১টার সময় রামনগরে আসিয়া পৌছিলাম। সম্মুখেই একটি ময়দান। ভায়া আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন, একটি সুন্দর পান্থনিবাস খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিকটবর্ত্তী অশ্বথ বৃক্ষের তলায় বিশ্রাম করিতেছেন। অশ্বটিও ছুটি পাইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। ভায়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলাম, তাহাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। অশ্বথ বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর নদীতে স্নান করিবার জন্য বাহির হইলাম। ভীষণ রৌদ্র, শরীর ঝলসাইয়া দিতেছে। মাটিতে পা দিতে পারা যাইতেছে না। রৌদ্রের তাপে দগ্ধ হইয়া নদীর নিকট উপনীত হইলাম। নদীতে হাঁটু

জল। স্রোতে বসিয়া পড়িলাম। সর্ব্বশরীর স্নিগ্ধ হইল। উঠিয়া আসিতে যেন ইচ্ছা হইল না। পুনরায় ভীষণ রৌদ্রে পুড়িতে পুড়িতে বাসায় ফিরিলাম। ষ্টেশন হইতে সংবাদ পাইলাম যে, রাত্রি দেড়টার সময় ট্রেণ পাওয়া যাইবে। সুতরাং তাড়াতাড়ি করিবার কোন প্রয়োজন না থাকায় মধ্যাহ্ন-ভোজন করিয়া বিশ্রাম করা গেল। সন্ধ্যার কিছু পরেই বাসা ছাড়িয়া ষ্টেশনে ওয়েটিংরুম দখল করিলাম। অনেক যাত্রী আসিয়া পৌছিলেন—ষ্টেশনটি যাত্রীতে পূর্ণ হইয়া গেল। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকগণ আসিয়া যাত্রিগণের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। যাহার যাহা অভাব সেচ্ছাসেবকগণ সাধ্যমত পূরণ করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে টিকিট ক্রয় করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। রাত্রি আড়াইটার সময় কাশীপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম, আমরা মুরাদাবাদ হইয়া যাইবার মনস্থ করিয়াছি—অতএব এখানে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার। প্রাতে সাড়ে ছয়টা পর্য্যন্ত কাশীপুরে অপেক্ষা করিতে হইল। সাড়ে ছয়টার সময় গাড়ীতে উঠিয়া অনুমান বেলা নয়টার সময় মুরাদাবাদ পৌছিলাম। ষ্টেশনের নিকটেই একটি সুন্দর ধর্ম্মশালা আছে। সমস্ত দিন ধর্ম্মশালায় থাকিয়া সন্ধ্যার সময় ষ্টেশনে ওয়েটিং রুমে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। রাত্রি নয়টার সময় ধর্ম্মশালার দরজা বন্ধ হয়। রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় মেল ট্রেণ ধরিলাম।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার। ট্রেণ ছুটিতেছে, সে অলকনন্দা নাই। হিমালয়ের সে অভ্রভেদী প্রাচীর নাই। দুই পার্শ্বে অনন্তবিস্তৃত প্রান্তর ধু ধু করিতেছে। মধ্যে মধ্যে উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ আসিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঝলসাইয়া দিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ধূলিরাশি আসিয়া সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া ফেলিতেছে। ধূলিতে সমস্ত গাড়িটি ধূলিময় হইয়া গেল। এইরূপ ধূলায়

স্থায় একটি খাড়া পাহাড় দেখিতে পাওয়া গেল। তাহার মাথার উপরে একখানি ঘর। এই ঘরখানি ব্যতীত আর একটুও জমি নাই। নদীটি আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিতেছে। অবশেষে আমাদের ঠিক সম্মুখে আসিয়া পড়িল। এখানে একটি পুল ছিল, এখন নাই, তাহার নিদর্শন আছে মাত্র। একটি অল্প গভীর স্থান দেখিয়া পদব্রজে নদী পার হইলাম। ক্রমে চকখুলা, গরজিয়া অতিক্রম করিয়া ঢিকুলীতে আসিয়া পৌছিলাম। ঢিকুলী রামনগর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে ছয় মাইল মাত্র। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উচ্চে ১৩৮০ ফিট। বোধ হয় পুর্ব্বে ইহা একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। মাটির কয়েক ফিট নিম্নেই পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এক্ষণে ইহা একটি সুন্দর গ্রাম—বেশ চাষ আবাদ হইতেছে। পাহাড় আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইতেছে। রাস্তার দুই পার্শ্বে সমতল ক্ষেত্র পাহাড় হইতে ঢলিয়া পড়িতেছে। স্থানে স্থানে রাস্তার পার্শ্বে সারিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণী পথিকগণের শ্রান্তি দূর করিতেছে। ক্রমেই সূর্য্যের উত্তাপ অধিক হইতে অধিকতর হইয়া পড়িতেছে, ক্রমে ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। অধিকক্ষণ কষ্ট করিতে হইল না। প্রায় ১১টার সময় রামনগরে আসিয়া পৌছিলাম। সম্মুখেই একটি ময়দান। ভায়া আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন, একটি সুন্দর পান্থনিবাস খুঁজিয়া বাহির করিয়া নিকটবর্ত্তী অশ্বথ বৃক্ষের তলায় বিশ্রাম করিতেছেন। অশ্বটিও ছুটি পাইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। ভায়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে আসিতেছিলাম, তাহাকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইলাম। অশ্বথ বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর নদীতে স্নান করিবার জন্ম বাহির হইলাম। ভীষণ রৌদ্র, শরীর ঝলসাইয়া দিতেছে। মাটিতে পা দিতে পারা যাইতেছে না। রৌদ্রের তাপে দগ্ধ হইয়া নদীর নিকট উপনীত হইলাম। নদীতে হাঁটু

জল। স্রোতে বসিয়া পড়িলাম। সর্ব্বশরীর স্নিগ্ধ হইল। উঠিয়া আসিতে যেন ইচ্ছা হইল না। পুনরায় ভীষণ রৌদ্রে পুড়িতে পুড়িতে বাসায় ফিরিলাম। ষ্টেশন হইতে সংবাদ পাইলাম যে, রাত্রি দেড়টার সময় ট্রেণ পাওয়া যাইবে। সুতরাং তাড়াতাড়ি করিবার কোন প্রয়োজন না থাকায় মধ্যাহ্ন-ভোজন করিয়া বিশ্রাম করা গেল। সন্ধ্যার কিছু পরেই বাসা ছাড়িয়া ষ্টেশনে ওয়েটিংরুম দখল করিলাম। অনেক যাত্রী আসিয়া পৌছিলেন—ষ্টেশনটি যাত্রীতে পূর্ণ হইয়া গেল। দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকগণ আসিয়া যাত্রিগণের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। যাহার যাহা অভাব সেচ্ছাসেবকগণ সাধ্যমত পূরণ করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে টিকিট ক্রয় করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। রাত্রি আড়াইটার সময় কাশীপুর ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলাম, আমরা মুরাদাবাদ হইয়া যাইবার মনস্থ করিয়াছি—অতএব এখানে গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ, সোমবার। প্রাতে সাড়ে ছয়টা পর্য্যন্ত কাশীপুরে অপেক্ষা করিতে হইল। সাড়ে ছয়টার সময় গাড়ীতে উঠিয়া অনুমান বেলা নয়টার সময় মুরাদাবাদ পৌছিলাম। ষ্টেশনের নিকটেই একটি সুন্দর ধর্ম্মশালা আছে। সমস্ত দিন ধর্ম্মশালায় থাকিয়া সন্ধ্যার সময় ষ্টেশনে ওয়েটিং রুমে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। রাত্রি নয়টার সময় ধর্ম্মশালার দরজা বন্ধ হয়। রাত্রি সাড়ে তিনটার সময় মেল ট্রেণ ধরিলাম।

২০শে জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার। ট্রেণ ছুটিতেছে, সে অলকনন্দা নাই। হিমালয়ের সে অভ্রভেদী প্রাচীর নাই। দুই পার্শ্বে অনন্তবিস্তৃত প্রান্তর ধু ধু করিতেছে। মধ্যে মধ্যে উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ আসিয়া সর্ব্বাঙ্গ ঝলসাইয়া দিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ধূলিরাশি আসিয়া সর্ব্বশরীর আবৃত করিয়া ফেলিতেছে। ধূলিতে সমস্ত গাড়িটি ধূলিময় হইয়া গেল। এইরূপ ধূলার

ধুসরিত হইয়া অনুমান চারিটার সময় বারাণসীধামে আসিয়া পৌঁছিলাম। ২২শে জ্যৈষ্ঠ কাশী হইতে যাত্রা করিয়া ২৩শে জ্যৈষ্ঠ লাহেরিয়া সরাই পৌঁছিলাম। রণেশ তখন লাহেরিয়া সরায়ে থাকিত। ভায়ার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ২৪শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে ট্রেণ ধরিলাম। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে হাওড়ায় পৌঁছিলাম।

ভগবানের আশীর্ব্বাদে শরীর এখন বেশ সুস্থ এবং সবল। যাত্রা করিবার সময় যাঁহারা নিষেধ করিয়াছিলেন তাঁহারা শরীরের অবস্থা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট ।

যমুনোত্তরী।

হরিদ্বার হইতে রেলপথে দেরাদুন। দেরাদুনে ঘোড়া বা দাণ্ডি পাওয়া যায়। দেরাদুন ছাড়িয়া প্রথমে রাজপুর পরে মসুরি। ১৫মাইল রাস্তা। রাজপুর হইতে মসুরি (৮মাইল) অত্যন্ত চড়াই। মসুরির নিকটেই লণ্ডোর। এখানে একটি পরিষ্কার হিন্দু হোটেল ও একটি ধর্ম্মশালা আছে। লণ্ডোর হইতে ঝালকী ৬মাইল। এখানে বড়ই জলকষ্ট। ঝালকী হইতে ধনোণ্টি ৯ মাইল। রাজপুর হইতে ধানোণ্টি পর্য্যন্ত একটি সোজা রাস্তা নূতন তৈয়ার হইয়াছে ১৮মাইল মাত্র। ঝালকী হইতে ৩ মাইলদূরে একটি রাস্তা টিহিরির দিকে গিয়াছে। ধনোণ্টীতে কালী কম্বলীওয়ালার একটি ধর্ম্মশালা আছে। ধনোণ্টী হইতে কানাতাল ৮ মাইল। মধ্যে সুরকণ্ডা দেবীর মন্দির। কানাতালে কালী কম্বলীওয়ালার আর একটি ধর্ম্মশালা আছে। কানাতাল হইতে বলডিয়ান ৯ মাইল। টিহিরির রাস্তা এখানে আসিয়া মিশিয়াছে। ৫ মাইল পরে ছাম। এখানে মহারাজা দেবশমসের-জঙ্গ বাহাদুরের একটি সুন্দর ধর্ম্মশালা আছে। ৩ মাইল পরে ধোলো। ধোলো হইতে ৫ মাইল দূরে নোগাঁউ। পরে ধরাসু, এখানে বাবা কালী কম্বলিওয়ালার একটি ধর্ম্মশালা আছে। এখান হইতে একটি রাস্তা গঙ্গোত্তরীর দিকে গিয়াছে। যমুনোত্তরীর দিকে যাইতে হইলে প্রথমে রাডীখাল পরে ১৫ মাইল চড়াই উঠিয়া কিছু উতরাই করিয়া যমুনাতীরে গঙ্গনানী। ধরাসু হইতে ২৪ মাইল। রাস্তাটি ভীষণ জঙ্গলের মধ্য দিয়া, অর্দ্ধপথে একটি ধর্ম্মশালা। গঙ্গনানী হইতে ১৬ মাইল দূরে হনুমানগাড়া মধ্যে ৪, ৯ ও ১৫ মাইলে অবস্থিত গ্রামে যাত্রীরা অবস্থান করে। তন্মধ্যে বজোরী গ্রামটি সর্ব্বাপেক্ষা বড়। গঙ্গনানী হইতে ২০ মাইল দূরে খরসালী। এখানে যমুনোত্তরীর পাণ্ডারা বাস করেন। ৪ মাইল পরে যমুনোত্তরী।

গঙ্গোত্তরী।

ধরাসু হইতে ডুণ্ডা ৮ মাইল। রাস্তা জঙ্গল মধ্যে। ডুণ্ডা হইতে উত্তরকাশী ৮ মাইল। এখানে টিহিরি রাজার একজন ডেপুটি কালেক্টার থাকেন। এখান হইতে দুইমাইল দূরে বিনসীগাড় পরে ছয় মাইল দূরে নিকালা। এখানে একটি দোকান আছে। পরে উত্তর-কাশী হইতে ৯ মাইল দূরে মনেরি। এখানে টিহিরি রাজার একটি ও কালীকম্বলীওয়ালার দুইটি ধর্ম্মশালা আছে। মনেরি হইতে ভাটোয়ারি ৯ মাইল। মধ্যে মনুহা। এখান হইতে একটি রাস্তা ত্রিযুগী নারায়ণের দিকে গিয়াছে। ভাটোয়ারিতে (ভটবাড়ী) একটি শিবমন্দির ও কালীকম্বলী-ওয়ালার ধর্ম্মশালা আছে। ধর্ম্মশালার নিকটেই গঙ্গার ঘাট। ভাটোয়ারি হইতে ৪ মাইল দূরে বুখী, ৯ মাইল দূরে গঙ্গনানী। নিকটেই পরাশর দেবের আশ্রম। একটি তপ্তকুণ্ড। এখানে পীলীভীত নিবাসী রাজা ললিতা প্রসাদ ও হরপ্রসাদের দুইটি ধর্ম্মশালা আছে। একমাইল পরে বঙ্গেলীগাড় ৪ মাইল পরে লুহারীবাগ। লুহারীবাগ হইতে ৮ মাইল দূরে সুখী। ১ মাইল চড়াইয়ের পর ঝালা। ৫ মাইল পরে হরশিলা। কানন ভূমির দৃশ্য অতীব মনোরম। নিকটেই একটি মন্দির ও ধর্ম্মশালা। হরশীলা হইতে ৪ মাইল পরে ধরালী ও ৮ মাইল পরে জাঙ্গলা। এখান হইতে ৮ মাইল দূরে গঙ্গোত্তরী, মধ্যে ভৈরব ও গৌরীকুণ্ড। গোমুখী গঙ্গোত্তরী হইতে ১৮ মাইল। এইস্থানে যাইবার রাস্তা অতি বিপজ্জনক। মহাপুরুষ ব্যতীত এখানে অনেক সাধারণ যাত্রীরা যাইতে সাহস করে না। ধরাসু হইতে গঙ্গোত্তরী প্রায় ৭৬মাইল। দেরাদুন হইতে যমুনোত্তরী, প্রায় ১০৯ মাইল।

ভটবাড়ী (ভাটোয়ারি) হইতে ত্রিযুগীনারায়ণ।

—:০:—

ভাটোয়ারি ভাস্করগঙ্গা ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। একটি সমৃদ্ধি-শালী গ্রাম। এখান হইতে ৯মাইল দূরে চোরনা। মধ্যে ৬মাইল পরে একটি ক্ষুদ্র চটি। চোরণা হইতে ৩মাইল পরে বেলক। বেলক হইতে ৫মাইল পরে পাঙ্গরানা। এখান হইতে ৬মাইল পরে ঝালাচটি—পরে ৬মাইল অতিক্রম করিলে বুড়াকেদার। এখানে বালগঙ্গা ও ধর্ম্মগঙ্গা নাম্নী দুইটি নদী আসিয়া মিশিয়াছে। এখানে শ্রীশ্রী৺বুড়াকেদারনাথ দেবের একটি মন্দির আছে। এখান হইতে ৩মাইল পরে বেতী ও ৫মাইল পরে হতকুড়। হতকুড়ে ভৈরবনাথ দেবের একটি মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। এখান হইতে ৫মাইল পরে ভৌত, ৮মাইল পরে পনেথী ও ১০ মাইল পরে ধুত্তু। এই গ্রামে রঘুনাথদেবের একটি মন্দির আছে। ধুত্তু হইতে ১০মাইল পরে পঁবালী। মধ্যে ১মাইল, ৪মাইল ও ৭মাইল পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চটি আছে। পঁবালী হইতে মগু ৯মাইল। মগু হইতে ত্রিযুগীনারায়ণ ৫মাইল। প্রায় সকল চটিগুলিতেই থাকিবার জন্ত দোকান ও কালীকম্বলিওয়ালার ধর্ম্মশালা আছে। ভটবাড়ী হইতে ত্রিযুগীনারায়ণ ৬৮ মাইল।

টিহরি হইতে শ্রীনগর।

টিহরি হইতে পৌ ১১ মাইল। পৌ হইতে ডাঙ্গচোরা ১৪ মাইল। ডাঙ্গচোরা হইতে শ্রীনগর ৮ মাইল। অর্দ্ধপথে কীর্ত্তিনগর। এখানে টিহরি রাজের একজন ডেপুটি কলেক্টার থাকেন।

কালীকম্বলিওয়ালা



কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পুণ্যক্ষেত্র হৃষিকেশধামে বিশুদ্ধানন্দস্বামী অবস্থান করিতেন। তিনি সদাসর্ব্বদা একখানি কাল কম্বল মুড়ি দিয়া থাকিতেন বলিয়া তাঁহাকে লোকে কালীকম্বলিওয়ালা বলিত। এখনও তিনি সকলের নিকট এই নামে পরিচিত। তাঁহাকে সকল সময়ই সাধু সন্ন্যাসী দ্বারা পরিবৃত দেখা যাইত। কলিকাতা বড়বাজারের বণিকপ্রবর স্বনামধন্য সুরযমল মহোদয় একদিন তাঁহার দর্শন লালসায় তাঁহার কুটিরে উপস্থিত হন, তখন তিনি সাধন ভজনে রত। তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ পাইয়া তিনি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। এবং তাঁহার কোন কিছু কাজে আসিতে পারেন কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। সাধুজী সন্তুষ্ট হইয়া প্রকাশ করিলেন যে যদি সম্মত হন তাহা হইলে তিনি অনেক কাজ করিতে পারেন। বুঝি বা ভগবৎ আদিষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার কাছে আসিয়াছেন। বণিকপ্রবর অকপট হৃদয়ে, সাধুজি যাহা অনুমতি করিবেন তাহা সাধ্যমত পালন করিতে স্বীকৃত হইলেন। সাধুজী তাহাকে সঙ্গে লইয়া সমগ্র উত্তরাখণ্ড পরিভ্রমণ করেন এবং যাত্রিদের সুবিধা অসুবিধা সমস্ত সম্যকরূপে দেখাইয়া দেন। এবং তাঁহার দ্বারা যাত্রিদের অসুবিধা নিরাকরণ হইবে তাহাও জানাইলেন এবং যে যে স্থানে যে রকম ব্যবস্থা করা উচিত তাহার পত্তন করিয়া আসেন। সাধুজীর প্রবর্ত্তনায় বণিকপ্রবর সুরযমল কেদার, বদরী, গঙ্গোত্তরী ও যমুনোত্তরীর পথে প্রায় সমস্ত চটিতে যাত্রিদের সুবিধার জন্য বাসোপযোগী ধর্ম্মশালা নির্ম্মাণ করিয়া

দিয়াছেন। ধর্ম্মশালাগুলি কম্বলিওয়ালার ধর্ম্মশালা বলিয়া অভিহিত। কোন কোন চটিতে সাধু সন্ন্যাসীরা সিধাও পাইয়া থাকেন। ইহারই ব্যয়ে লছমনঝোলা সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা যাত্রিদের যে কত সুবিধা হইয়াছে তাহা বর্ণণাতীত। লছমনঝোলা সুরযমলের মাতৃভক্তির নিদর্শন। মাতৃ আজ্ঞায় তিনি এই সেতু নির্ম্মাণ করেন।